সাধন-সোপান

দ্বিতীয় ভাগ

[জীবন্মুক্তি]

গুপ্তিপাড়া-বাস্তব্য
পণ্ডিত শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ।

সাধন সোপান

দ্বিতীয় ভাগ

[জীবন্মুক্তি]

এককর্তৃত্ববোধঃ স্যাদ্‌গৃহিনাম্ যোগ উত্তম।
তদ্যোগস্থ পবিত্রাত্মা জীবন্মুক্তঃ কলৌযুগে॥

জামসেদপুর কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীশ্রী৺কামনাদেবী কালীমাতার
সেবায়েৎ, গুপ্তিপাড়ার "দয়াময়ী" দশভূজা দুর্গামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা,
বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা —

পণ্ডিত শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—গুরুচরণাশ্রিত শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
কালীবাড়ী, জামসেদপুর পো।

মূল্য—১৲ টাকা।

পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা :—

১। ম্যানেজার কানাইলাল শীল,
ডায়মণ্ড লাইব্রেরী,
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

২। ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য,
তর্কবাগীশ বাড়ী,
পোঃ গুপ্তিপাড়া (হুগলি)।

৩। শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য,
কালীবাড়ী, জামসেদপুর পোঃ।

৪। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সিম্‌লা কালীবাড়ী,
পোঃ সিম্‌লা (পাঞ্জাব)।

প্রথম পৃষ্ঠা হইতে ৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত
জামসেদপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ
হইতে মুদ্রিত। গ্রন্থের অবশিষ্ট
সমুদয় অংশ জামসেদপুর বাণী প্রেস
হইতে শ্রীহরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সাধন-সোপান—দ্বিতীয় ভাগের

ভূমিকা।

এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরের অসহনীয় তাণ্ডবতার মধ্যে বহু ঝঞ্ঝাট অতিক্রম করিয়া সাধন সোপানের দ্বিতীয় ভাগ একমাত্র জগদম্বার কৃপায় প্রকাশিত হইল। যাঁহারা ইহার প্রথম ভাগ পাঠ করিয়াছেন, দ্বিতীয় ভাগ পাঠে তাঁদের আগ্রহ অবশ্যই হইবে। তবে ইহা বলিতে হইবে, সাধন সোপানের সার্থকতা কেবল পাঠে নহে—অনুষ্ঠানে। লেখকের লিপি-কৌশলে অনুষ্ঠানের আগ্রহ জাগিলেও কতকটা পরিশ্রম-সাফল্য হইবে। কেন না, আজ হিন্দুর চিত্ত বিক্ষিপ্ত-বহির্ম্মুখ, অন্তরের সাধনার প্রতি উদাসীনতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। শিক্ষা-সংসর্গ-পরিস্থিতি সমস্তই বিপরীত। বিরুদ্ধ ভাব-প্রবাহ আজ আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই বিপরীত প্রবাহ ফিরাইতে কোন মনুষ্যের শক্তি নাই,—সাধনার ধন সেই জগদম্বা যদি কৃপা করেন, তবেই ভাবধারার পরিবর্ত্তন ও সাধনার প্রতি অনুরাগ সম্ভবপর হইতে পারে। অথচ তাঁর কৃপালাভ করিতে হইলে, চাই সাধনা। যদি সাধনা ও দেবী-কৃপা পরস্পরসাপেক্ষ হয় তাহার সঙ্ঘটন কিরূপে সম্ভবপর হইবে, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্ত্রী জগদম্বাই জানেন। তবে ব্যক্তিগত প্রযত্ন অবশ্যই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে উদ্বুদ্ধ হইবে। যাহার যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাধন-পথের আলোকপাত করিতে হইবে। শ্রীমান্ ভূপতিচরণ সেইরূপ প্রযত্ন করিয়া আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

সাধন সোপান প্রথম ভাগের প্রতিপাদ্য ছিল—জীবন গঠন।

কিরূপ বৈধ অনুশীলনের দ্বারা নিত্যবস্তু লাভের অনুকূলে জীবন গঠিত হয়, গৃহস্থগণ পুত্রকলত্রাদির মধ্যে থেকেও কেমনভাবে প্রাত্যহিক উপাসনায় অগ্রসর হতে পারেন, দীক্ষাদি প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি কিরূপভাবে হওয়া উচিত—প্রথম ভাগে যথাশাস্ত্র আলোচিত হয়েছে। সাধন সোপান দ্বিতীয় ভাগের প্রতিপাদ্য—জীবন্মুক্তি। ইহাতে প্রথম ভাগের বিষয়গুলি বিশদ আলোচনা দ্বারা আরও আলোকিত করা হয়েছে। ইহাতে কেমনভাবে, অব্যক্ত ব্রহ্ম কেবলমাত্র স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে গুণভেদে রূপের ভেদ সৃষ্টি করিয়া তাঁর সৃষ্ট জীবকে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া লীলা করিতেছেন, সাধক গৃহীগণ কেমন করিয়া তাঁরই কৃপাবলে সেই দুর্লঙ্ঘ মায়া-প্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে, কেমন করিয়া তাঁরই সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া তাঁর অসীম কর্ত্তৃত্বে নিজকর্ত্তৃত্ব মিলাইয়া জীবন্মুক্তির কোঠায় পৌঁছাতে পারে—এইসব অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরক্রমে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই বিশিষ্ট ভূখণ্ডের সাধকমণ্ডলী যুগে যুগে যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং যেভাবে সমাজের হিতার্থে অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন—তাহা আজিও অতুলনীয়। সে অমৃত-আত্মজ্ঞান এককর্ত্তৃত্ববোধ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হওয়াতে, আত্মজ্ঞানের প্রতি আমাদের দেশের লোক কতকটা আস্থাহীন হইয়াছিল। কিন্তু আজ এই করাল-সমর-তাণ্ডবে অবিরত ধ্বংসলীলার করুণ দৃশ্য দর্শনে লোকের যেন কতকটা চেতনা হইতেছে। নিত্যবস্তু লাভ করিতে না পারিলে জীবের প্রকৃত কল্যাণ নাই। উহা লাভ করিতে হইলে, অগ্রগামী সাধকগণের পরিচিত সাধন সোপান আশ্রয় করিতেই হবে। সাধন সোপানের প্রত্যেক স্তর ধীরে ধীরে অতিক্রম করিলে, সেই নিত্যবস্তু—আত্মতত্ত্বে পৌঁছিতে পারা যায়। সাধন সোপান দ্বিতীয় ভাগে এই সকল আলোচনা পরিস্ফুটভাবে থাকায়, ইহা সাধারণের কল্যাণ-পথ প্রদর্শন করিবে।

ইতি—

শুভ ১লা বৈশাখ,
সন ১৩৫১ সাল।

শ্রীবীরেশ নাথ বিদ্যাসাগর,
মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের প্রবীণতম অধ্যাপক

ঋষিকল্প-সাধকের আশীর্ব্বাদ-পত্র :—

সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী সাধকোত্তম পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বারাণসীক্ষেত্রে অন্তিম শয্যায় অবস্থানকালে তাঁর মুখনিঃসৃত নিম্নলিখিত শেষ শ্লোকের দ্বারা "সাধন সোপানকে" স্নেহাশীষ দান করিয়াছেন

কাশীধাম,

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪৭।

শ্রীমদ্-ভূপতিচরণ-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ-বিরচিতৈষা।
সাধন-সোপান-স্রগ্ বিভূষয়তু সাধকং কণ্ঠে॥
অস্যাং পুষ্পে পুষ্পে মনোহরে রূপসৌরভে ভবতঃ।
যাভ্যাং তর্পিততুষ্টৌ সাধকসাধ্যৌ ক্রমেণ স্তঃ॥

শুভাশীঃ

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র।

প্রথম স্তবক।

দ্বিতীয় স্তবক।

সাধন-সোপান।

—:—

অবতরণিকা

গুণভেদে রূপভেদ

শিষ্য—গুরুদেব ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনটী দেবতার মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কে মধ্যম, কে কনিষ্ঠ, এবং ইঁহাদের স্বরূপ কি, দয়া করিয়া বলুন।

গুরু—বৎস ! এমন একটী অবস্থার কল্পনা কর—ভূমি নাই [illegible] নাই, অগ্নি, জল, স্থল, আকাশ, বাতাস নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা নাই, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর নাই, জীব জন্তু, কীট-পতঙ্গ, দ্রষ্টা, দৃশ্য কিছুই নাই,—ইহাই অব্যক্ত নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম। এই অব্যক্ত অবস্থায় "আমি বহু হইব" এইরূপ একটী ইচ্ছা স্পন্দিত হইল। ঐ স্পন্দন বা শব্দ-রূপ ভাবটী তিনটী ভাবে তিনটী রূপ পরিগ্রহণ করিল।

শিষ্য—কি কি তিনটী রূপ পরিগৃহীত হইল ? গুরুদেব !

গুরু—অব্যক্ত ব্রহ্মে প্রথম ভাব উঠিল সৃষ্টি, দ্বিতীয় ভাব স্থিতি, তৃতীয় ভাব লয়। বহু হইবার ইচ্ছারূপ একটী ভাবই সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনটী গুণে গুণিত হইয়া প্রথম ক্ষণে যে ভাব উঠিল—তাহাই সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকাশক রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা

প্রজাপতি। ইহার মধ্যে সত্ত্ব ও তমোগুণ থাকিলেও ইনি রজোগুণ প্রধান, ইহার কার্য্য গ'ড়ে তোলা; দেবতা, অসুর হইতে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি এই দৃশ্যমান জগৎ সবই সৃষ্টি করিলেন। ইঁহার শক্তি সাবিত্রী।

শিষ্য—রজোগুণ ও সাবিত্রী বলিতে কি বুঝায় ?

গুরু—সূ ধাতু থেকে সাবিত্রী শব্দটী তৈরী হ'য়েছে। সূ ধাতুর অর্থ প্রসব করা, উৎপন্ন করা। রজ শব্দের দুইটী অর্থ,—রক্ত এবং ধূলিকণা। একটী জীব সৃষ্টি করিতে হইলে রজ বা শোণিতের সহিত বীজাণুর সম্বন্ধ হওয়া চাই, ইহাই জীব জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। আবার জড়জগৎ সৃষ্টির মূলেও রজ অর্থাৎ ধূলিকণার সংযোগসম্বন্ধ আছে। সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকাশক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, রজোগুণপ্রধান বলিয়া উঁহার প্রতীক রূপটীও রক্ত বর্ণ। এইরূপ দ্বিতীয় ক্ষণে যে ভাব উঠিল তাহা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বিষ্ণু বা নারায়ণ, অর্থাৎ পালনতত্ত্বের প্রকাশক। এরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মে তৃতীয় ক্ষণের ভাব উঠিল তমোগুণাত্মক মহেশ্বর বা রুদ্র, সংহার তত্ত্বের প্রকাশক।

শিষ্য—তিনটী ভাবের কি প্রয়োজন ছিল, একটী ভাব উঠিলেও ত হইত ? অব্যক্ত ব্রহ্মে বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইবার কি প্রয়োজন ছিল ? গুরুদেব !

গুরু—না বৎস, প্রথমতঃ একটি ভাব অন্য একটীর অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। অব্যক্ত ব্রহ্মে একটি ভাবই ত ছিল, উহা অপ্রকাশ ছিল—অব্যক্ত ছিল। বহু হইবার ইচ্ছা লইয়া উহা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া প্রকাশ

হইল। বুঝিয়া দেখ—কোন একটি জিনিষ তৈরী হলেই তাকে বাঁচিয়ে বা প্রকাশ ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয়, নতুবা বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে তৈরী করার কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। বিষ্ণু ব্যাপ্তিরূপে চিৎশক্তি বা প্রাণশক্তি নিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রয়েছেন ব'লেই সৃষ্টিতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। নতুবা উৎপত্তির শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন আর দাঁড়াতে পারত না, উৎপন্ন শেষ হয়ে যেত, অর্থাৎ ধ্বংস হ'ত। এক কথায় সেই অব্যক্তই থেকে যেত। সত্ত্বগুণাত্মক দেবতা নারায়ণ সেই সৃষ্টির অবস্থাটুকু ধরে রেখেছেন—ইহার নাম পালন। ইহার শক্তি লক্ষ্মী।

শিষ্য—আচ্ছা গুরুদেব, উৎপত্তি ও স্থিতি হইলেই ত বেশ কাজ চলিত, আবার ধ্বংসের কি প্রয়োজন হইল? রুদ্রমূর্ত্তির কি দরকার হইল?

গুরু—বেশ কথা, প্রথমেই ঠিক করিয়া লও, ধ্বংস অর্থে কি বুঝিলে? "ধ্বংস" ইহার অর্থ লয়, বা পরিবর্ত্তন, বা রূপান্তরিত হওয়া। মনে কর—জরায়ুতে একটি বীজবিন্দু শোণিতের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হইল, প্রজাপতি এই সৃষ্টির প্রথম অবস্থাটুকু করলেন, বিষ্ণু সেইটুকু ধরে রাখলেন, রুদ্র সেই ধরে রাখা অবস্থাটুকুকে ধ্বংস করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দ্বিতীয় অবস্থার সৃষ্টি হইল, বিষ্ণু তাহা ধরে রাখলেন, রুদ্র সেই অবস্থাকে সংহার করলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতি আবার তৃতীয় অবস্থার সৃষ্টি করলেন। এইভাবে আবার স্থিতি আবার সংহার। এইরূপ কলাকাষ্ঠাদির মধ্যে ও অনন্তকোটী

বার অবস্থার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংঘটিত হচ্ছে; তাই জগৎ ব্যাপার দৃশ্য হচ্ছে—ঠিক বায়স্কোপের মত, এত দ্রুত পরিণতি বা পরিণমন ক্রিয়া ছুটছে, উহার মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হচ্ছে, তাহা স্থুল দৃষ্টিতে ধরা যাচ্ছে না। তোমার চোখের সামনে একটী গাছ বড় হ'য়ে চলেছে, বল দেখি বৎস, প্রতিদিন তার ছোট অবস্থাকে কোন্ সময় ধ্বংস করছে, কোন্ সময় তার নূতন অবস্থাকে সৃষ্টি করছে?

শিষ্য— না গুরুদেব স্থুল দৃষ্টিতে ধরা যাচ্ছে না।

গুরু—ঠিক বলেছ—কিন্তু উহা ঘটছেই। নতুবা গচ্ছতীতি জগৎ ব্যাপার চল্‌তেই পারে না। এইজন্য দেবগণ সমবেত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি। বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে, নারায়ণি নমোস্তুতে॥ সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে!

শিষ্য—আপনি যে বলিলেন,—তমোগুণের প্রকাশক রুদ্র, তিনি ত' মহাদেব, স্বচ্ছ সরল আশুভোলা, জ্ঞানময় পুরুষ, ইনি কেমন করে তমোগুণের প্রকাশক হলেন, সাধারণ সংস্কারে ইহা ত বেশ খাপ খাচ্ছে না?

গুরু—হাঁ বৎস, আরও পরিষ্কার করে বলি। অব্যক্ত ব্রহ্মের তৃতীয় রূপের প্রকাশ 'লয়'। ইহার কার্য্য সংহার অর্থাৎ সম্যক হরণ এক কথায় পরিবর্ত্তন সাধন। ইহার দেবতা শিব, তমোগুণাশ্রিত আবরণ শক্তি।

শিষ্য—তমোগুণ কাকে বলে গুরুদেব?

গুরু—তমঃ প্রকৃতেগুণবিশেষঃ তং তু আবরণং। (শব্দকল্পদ্রুমঃ) সমস্ত গুণকে ঢেকে ফেলা—সব ভুলিয়ে দেওয়া ভোলানাথই তাঁর রূপ, রুদ্রাণী তাঁর শক্তি। এক অবস্থাকে ঢেকে ফেল্লেই অন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে ঐ যে ঢেকে ফেলা, পরিবর্ত্তন সাধন, উহার নাম ধ্বংস। ভাল অবস্থাকে ঢেকে ফেলে মন্দর রূপ নিয়ে আসা আবার মন্দ অবস্থাকে ঢেকে ফেলে ভালর রূপ নিয়ে আসা তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করিলে ইহা একই কার্য্য।

শিষ্য—হাঁ দয়াময় বেশ বুঝলাম অজ্ঞানকে ঢেকে ফেল্লেই যেমন জ্ঞানের প্রকাশ জ্ঞানকে ঢেকে ফেল্লেই যেমন অজ্ঞানের বিকাশ যেমন সূর্য্য ভূপৃষ্ঠাদির দ্বারা আচ্ছাদিত হলেই অন্ধকার আবার ঐ আচ্ছাদনের ধ্বংস হলেই আলোকরেখা—তমোগুণের কার্য্য। ঠিক ঐরূপ নয় গুরুদেব?

গুরু—হাঁ বৎস ঠিক বুঝেছ। তাহলেই দেখ—জ্ঞান অজ্ঞান ভাল মন্দ বিদ্বান মূর্খ সুরূপ কুরূপ সুখ দুখ যাঁর নিকট সমান বোধে অম্বিত অর্থাৎ যিনি ভেদ বুদ্ধির অতীত নিত্যশুদ্ধবোধবিশিষ্ট তিনিই শিব। তিনি আবরণ শক্তি পরিচালন করেন সুতরাং তিনি তমোগুণের নিযামক।

শিষ্য—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনটি দেবতার কার্য্য তাহলে একসঙ্গেই চলে, নয় গুরুদেব?

গুরু—হাঁ বৎস এইটুকু ভাল করে বুঝলেই উহাদের স্বরূপটী উপলব্ধি করতে পারবে। দেখ—কতকগুলি অণু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইট কাঠ পাথর প্রভৃতি প্রস্তুত হয় আবার ঐ ইট কাঠ পাথর সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাড়ী ঘর নৌকা জাহাজ পাহাড় পর্ব্বত অনেক কিছু

হয়। শুক্র ও শোণিত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জীব তৈয়ারী হয়। এই সঙ্ঘবদ্ধ করে রাখে কে? বল দেখি কে ঐ শোণিত সংযোগে শুক্রনিহিত কীটটীকে পরিবর্দ্ধিত ক'রে একটী বৃহৎ জীবে পরিণত করেন? বল দেখি কেন ঐ অণুগুলি বায়ুস্তরে ভেসে যাচ্ছে না?

শিষ্য—হাঁ গুরুদেব, উনিই চিৎশক্তি উনিই প্রাণশক্তি উনিই নারায়ণ। উনিই চিৎশক্তির দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

গুরু—হাঁ বৎস ঠিক ধরেছ। ঐ সংঙ্ঘবদ্ধ করে রাখার নামই পালন। আবার উহার নামই স্থিতি। একটী ভাব উৎপন্ন হয় কিছুক্ষণ থাকে আবার চলে যায়। তুমি ঈশ্বরের চিন্তা করিতেছ—প্রসঙ্গ মনোমধ্যে উঠিল, থাকিল, চলিয়া গেল। এইভাবে কত তরঙ্গ উঠছে থাকছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের বিরাম নাই বিশ্রাম নাই। তাই জগৎ ব্যাপার চঞ্চল। অব্যক্ত ব্রহ্ম "আমি বহু হইব," এই ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপে অবিরাম স্পন্দন নিয়েই অবিরত ছুটেছেন। তাহলেই বুঝিয়া দেখ—প্রতিক্ষণেই তোমার মনের মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কেমন লীলা চলেছে। বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় ঐ সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপে ঐ লীলাই চলেছে—তাই এতই বৈচিত্র। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেহ একলা থাকতে পারেন না। স্থূল দৃষ্টিতে উহাদের পৃথক পৃথক রূপ দেখা না গেলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায়। জগদ্ব্যাপারে মণিমালার মত উহারা একসূত্রে অনুস্যূত।

শিষ্য—ঐ যে এক সূত্র বলিলেন ঐটী কি?

গুরু—ঐটীই সব। ঐ যে অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত হবার স্পন্দন উঠিল—"আমি বহু হইব"—ঐ "আমি"ই সব। পরে

ইহার আরও বিশদ ব্যাখ্যা বলিব। এখন তোমার মূল প্রশ্নের উত্তর শোন—ঐ যে সৃষ্টি স্থিতি লয় ইহাদের একটীকে বাদ দিয়া অন্যটীর প্রকাশ হয় না। উৎপত্তির মধ্যে যেমন স্থিতি ও লয় রয়েছে নইলে উৎপত্তি দাঁড়ায় না, স্থিতির মধ্যেও তেমনি উৎপত্তি ও লয় রয়েছে নইলে স্থিতির প্রকাশ হয় না। আবার লয়ের মধ্যেও উৎপত্তি ও স্থিতি রয়েছে নতুবা লয়ই বা কাকে নিয়ে সংঘটিত হয়? সুতরাং ঐ সৃষ্টিস্থিতিলয়ের প্রতীক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। একাকে বাদ দিয়ে অন্যের উপলব্ধি হয় না—তিনটী দেবতার পরস্পর সহযোগিতা না হইলে জগদ্ব্যাপার বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্রহ্মা বড় কি বিষ্ণু বড় কি শিব বড় এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। ইহা অজ্ঞতারূপ পাগলামি ভিন্ন কিছুই নয়। উঁহারা তিনে এক, একে তিন। কেহ কাহাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না কেহ কাহাকে ছেড়ে প্রকাশ হতেই পারেন না। হরিহর ব্রহ্মা এক আত্মা, নিরাকার ব্রহ্মের সাকার রূপ।

শিষ্য—তবে আমরা উঁহাদিগকে পৃথক পৃথক রূপে দেখছি কেন? উঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক কর্ত্তৃত্ব আছে ইহা মনে করছি কেন?

গুরু—যতক্ষণ তোমার নিজের মধ্যে পৃথক কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকবে ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেন সর্ব্বত্রই পৃথক কর্ত্তৃত্ব দেখবে। ঐপৃথক কর্ত্তৃত্ব বোধই ত বন্ধন, মায়া, অশান্তি। ঐ বোধ নষ্ট করে দেওয়াই ত' তোমার লক্ষ্য তোমার সাধনা তোমার ভব-যাতনার অবসান, তোমার জীবন্মুক্তি। চল বৎস, লক্ষ্য স্থির রেখে অগ্রসর হও।

শিষ্য—এইবার এদের শক্তি ও গুণের কথা একটু বলুন।

গুরু—মোটামুটী আমরা পাচ্ছি—ব্রহ্মার শক্তি—সাবিত্রী, বিষ্ণুর শক্তি—লক্ষ্মী এবং রুদ্রের শক্তি—রুদ্রাণী। "শক্তি শক্তিমতোর ভেদঃ" শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন একই জিনিষ। শক্তিমান না থাকলে শক্তির বিকাশ হয় না। আর শক্তি না থাকলে শক্তিমানের উৎপত্তিই হয় না। শক্তি ও শক্তিমান যেমন অভেদ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যেমন অভিন্ন সাবিত্রী লক্ষ্মী রুদ্রাণী বা দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা শ্রীরাধা শ্রীশীতলা ইত্যাদি সবই অভিন্ন। একই মহাশক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে কেহ উৎপন্ন করছেন কেহ পালন করছেন কেহ সংহার করছেন। সাধন সোপানের ধাপে ধাপে উঠতে আরম্ভ কর—বেশ উপলব্ধি করতে পারবে। ঐ দেখ—সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপা মাকে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সৃষ্টির অধিপতি স্বয়ং ব্রহ্মা কেমন সুন্দর স্তব করছেন। ত্বমেব মা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা। বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং, স্থিতিরূপা চ পালনে॥ তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥ ইহার অর্থ—হে দেবি! তুমি সাবিত্রী রূপে জগজ্জননী, সৃষ্টিকার্য্যে সৃষ্টিরূপা, পালনকার্য্যে স্থিতিরূপা, আবার সংহারকার্য্যে সংহৃতিরূপা। অর্থাৎ হে অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি! তুমি সৃষ্টিস্থিতিলয় রূপে প্রকট হয়েছ।

এইবার শোন গুণবিভাগের কথা। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর যেমন একক প্রকাশ হতে পারেন না, তেমনি রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ এই তিনটী গুণও একক প্রকাশিত হয় না। কেবল বিমিশ্র রজোগুণ কোথাও নাই। ঐরূপ সত্ত্ব ও তমোগুণও বিমিশ্র নাই।

শিষ্য—তাহাহইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার মধ্যে রজোগুণ ছাড়াও সত্ত্ব ও তমোগুণ আছে?

গুরু—নিশ্চয়ই। তবে প্রজাপতি ব্রহ্মার মধ্যে রজোগুণ প্রধান, সত্ব ও তমোগুণ কিছু কিছু আছে। এইরূপ বিষ্ণুর মধ্যে সত্বগুণের প্রাধান্য আছে; তম ও রজোগুণও কিছু কিছু আছে। ঠিক ঐরূপ রুদ্রের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য থাকলেও উহাতে সত্বগুণ বা রজোগুণও আছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে—তিনটিগুণের সহযোগিতা না পেলে কোনটি থাকতে পারে না।

শিষ্য—গুরুদেব! ঐ তিনটী গুণ কোন বস্তুতে কি সমানভাবে থাকতে পারে না?

গুরু—না বৎস! তিনটী গুণ সমান হইলে আর ভেদ থাকে না। গুণে ভেদ না থাকিলে রূপেও ভেদ থাকে না। রূপে ভেদ না থাকলে উপাধির প্রয়োজন হয় না। আবার উপাধি না থাকলে তাঁর বহু হইবার ইচ্ছা পরিস্ফুট হয় না। ন্যূনাধিক হিসাবে তিনটী গুণের সংমিশ্রণ হয় বলিয়াই অগণিত রূপভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপভেদ আছে বলিয়াই এ বিশ্ব বৈচিত্রময়। বিভিন্নকার্য্যে পৃথক পৃথক ধারা তাই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে বিশ্বপ্রকৃতি বহুধা মুখরিত। ঐ তিনটী গুণের সংমিশ্রণে অনন্ত কোটী ভেদ আছে, তাই দুইটি মানুষ দুইটি পাতা দুইটি ফুল দুইটি প্রকৃতি কোথাও দুইটিতে সমসাদৃশ্য নাই। মাত্র আংশিক সাদৃশ্য আছে। ঐ আংশিক সাদৃশ্যের সাহায্যেই অগণিত জাতির গঠন হইয়াছে। দুইটি পাতা দেখিতে এক হইলেও তার শিরায় শিরায় কত ভেদ। দুইটা হাঁড়ী দুইটি ভাটা দুইটা টাকা আপাত দৃষ্টিতে দেখতে এক হলেও আণুবিক সংস্থান সম্বন্ধে কতই বিভেদ আছে লক্ষ্য করিও।

শিষ্য—সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি কিভাবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিলেন দয়া করিয়া বলুন।

গুরু—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভূতই প্রধান উপাদান। ইহা হইতে যথাক্রমে গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ সৃষ্টি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলির গ্রাহক যথাক্রমে নাসিকা জিহ্বা চক্ষু ত্বক ও কর্ণ প্রস্তুত করিলেন। তারপর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ প্রস্তুত হইল। আবার এই সব গুলির নিয়ামক মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিলেন। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারাই পরিদৃশ্যমান জগৎ গঠিত হয়েছে এবং চালিত হচ্ছে।

শিষ্য—এইগুলিকে তত্ত্ব বলিতেছেন কেন? তত্ত্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

গুরু— তস্য ভাবঃ অর্থাৎ তাঁহার ভাব যাহা তাহাই তত্ত্ব বলিয়া কথিত।

শিষ্য—তাঁহার ভাব এক্ষনে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির ভাব?

গুরু—তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন যে 'আমি' সেই 'আমি'র ভাবও বলিতে পার। পূর্ব্বেই বলেছি— ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর ঐ 'আমি' ইহারা একই।

শিষ্য—সমস্ত বিশ্বমণ্ডলটাই ত ঐ আমির ভাব তবে মাত্র ঐ ২৪টীকে তত্ত্ব বলিতেছেন কেন? সমস্ত জগৎটাই ত তাঁর তত্ত্ব।

গুরু—তুমি যা বলেছ তা ঠিক—সমস্তই তাঁর ভাব, সমস্তই তত্ত্ব। কিন্তু এখানে ঐ ২৪টিই প্রধান মৌলিক ভাব। উহার সমন্বয়ে অনন্ত কোটী ভাবেরই সৃষ্টি হয়। তাই ঐগুলিকে 'তত্ত্ব' বলিয়া বিশেষ আখ্যা দেওয়া হইল। সৃষ্টিকর্ত্তা এইগুলির সমন্বয়ে সূর্য্য

চন্দ্র দেব দানব হইতে মানব কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতা ফলমূল প্রভৃতি সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সত্ত্ব রজ তম গুণ ভেদে ঐগুলির মধ্যে অগণিত রূপভেদের সৃষ্টি করিলেন। এইজন্য সমুদয় জীব-জগৎ ও জড়জগৎকে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকভেদে মোটা মুটি তিন প্রকারে ভাগ করা যায়।

শিষ্য—সাত্ত্বিক জীব কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কি গুরুদেব ?

গুরু—যে সমস্ত জীবের মধ্যে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণকে দাবিয়ে প্রাধান্যলাভ করেছে তারাই সাত্ত্বিক জীব। সত্ত্বগুণনিয়ামক বিষ্ণু যেমন উৎপত্তিকে ধরে রাখেন, স্থিতিকারক সাত্ত্বিক জীব তেমনি জগৎটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, বুদ্ধিটাকে চঞ্চল হইতে দেন না স্থিরধী হতে চেষ্টা করেন সুখদুখের অতীত হন। ইঁহারা সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন সর্ব্ব জীবের সেবা করেন ইঁহারা আহারে,বিহারে বসনে ভূষণে গৃহে প্রসাধনে ভজনে পূজনে বলনে চলনে যানে প্রহরণে সর্ব্বত্র আড়ম্বর পরিশূন্য হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান দ্রব্যগুলি ভক্তিভাবে ঈশ্বরোপাসনায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণাত্মক দ্রব্যগুলিই প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন।

শিষ্য—ইঁহারা কি কাহারও হিংসা করেন না ?

গুরু—না বৎস, ইঁহারা স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূল পুষ্প, সমিধ দ্বারা শ্রীভগবানের ভোগরাগ আরাধনা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রজ-গুণ বা তমোগুণের বৃদ্ধিকারক মৎস্যমাংসাদি স্পর্শও করেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব আখ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। চিৎশক্তি বা প্রাণশক্তির যিনি তত্ত্ব সম্যক অবগত হ'তে পেরেছেন,

তিনিই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়াও বহু প্রাণের সেবা করেন যিনি, তিনিও পরম বৈষ্ণব। আবার এই সাত্ত্বিক মহাপুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা মনেপ্রাণে অহিংসক, যাঁহারা সুউচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহারা গোবৎস বা ছাগশিশুকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের মায়ের নিকট হইতে দুগ্ধও গ্রহণ করেন না। স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলই মাত্র তাঁহাদের আহার্য্য।

শিষ্য—'স্বচ্ছন্দ বনজাত' বলিলেন কেন? ঐরূপ না হইলে কি হিংসা আছে?

গুরু—আছে বৈ কি বৎস। চাষ আবাদে গোমহিষাদি নিরীহ জন্তুগুলিকে কতই কষ্ট দিয়া শস্য উৎপন্ন করান হয়। মহাপুরুষগণের সাত্ত্বিক প্রাণে তাহাও হিংসা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শিষ্য—ঐরূপ মহাপ্রাণ সাত্ত্বিক পুরুষের মধ্যেও কি রজোগুণ বা তমোগুণ আছে?

গুরু—পূর্ব্বেই বলেছি—তিনটী গুণেরই ন্যূনাধিক সংমিশ্রণ না হইলে জগৎ সৃষ্টিই হয় না, দৃশ্যমানও হয় না। যিনি যতবড়ই মহাপুরুষ হউন না, তিনি সৃষ্টিছাড়া নন। গ'ড়ে তোলা, ধ'রে রাখা, ভেঙ্গে ফেলা—এই তিনটী রজ সত্ত্ব ও তমোগুণের কার্য্য—একথা ভুলিলে চলিবে না। এবং ঐ তিনটী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কার্য্য একথাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। নতুবা এতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। ঐ যে সাত্ত্বিক মহাপুরুষ যখন ভগবদ্ধ্যানে বসেন তখন ধ্যানে বসিবার ভাবটী গঠন করিলেন, এই গ'ড়ে তোলা কাজটী রজোগুণের—এইটি না হইলে ধ্যানে বসিতে পারিতেন না। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় ঐ ধ্যানভাব বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিলেন, তারপর তমোগুণের

প্রভাব একটু আছে বলিয়াই ঐ ধ্যানভাব ভাঙ্গিল অর্থাৎ ঐ ভাবটা আবৃত হইল, চাকা পড়িল, তাই অন্য ভাবে নামিয়া আসিতে পারিলেন। যখন অন্য ভাবে নামিয়া আসিলেন—বুঝিয়া দেখ—ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তখনই আর একটি ভাব গ'ড়ে তুললেন। যদি কোনদিন ঐ মহাপুরুষের তমোগুণ একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ ধ্যান আর ভাঙ্গিবে না, নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হয়ে যাবেন, তাঁর জীবত্বের অবসান ঘটিবে, তিনি তখনও সৃষ্টিছাড়া হবেন।

শিষ্য—গুরুদেব! দয়াময়! একটু সংশয় রয়েছে। ঐ মহাপুরুষের যখন তমোগুণ তিরোহিত হবে তখন তিনি ঐ ধ্যানাবস্থায় যুগ-যুগান্তর ধরে বসে থাকুন না, কেন,তাঁর জীবত্বের অবসান হবে?

গুরু—ঐ মহাপুরুষের তমোগুণ তিরোহিত হইলে ভাঙ্গা কাজ যেমন বন্ধ হইল তেমনি সমুদয় গড়া কাজও বন্ধ হইয়া গেল। ভাঙ্গা-গড়া বন্ধ হইয়া গেলে, শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, শোণিত প্রবাহের ক্রিয়া, ক্ষয় ও পূরণের ক্রিয়া, এক কথায় জীবনরক্ষার জন্য দেহে যে ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে—সবই বন্ধ হইয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে দেহ ছুটিয়া যায়। তাই বলছি—যতক্ষণ দেহ থাকিবে ততক্ষণ তিনটী গুণই ন্যূনাধিক হিসাবে থাকিবেই।

শিষ্য— রাজসিক জীব ও তামসিক জীব কাহাকে বলে, তাহাদেরই বা কি লক্ষণ?

গুরু— সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে দাবিয়ে, রজোগুণ যে জীবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই জীবকে রাজসিক জীব বলে। ঐরূপ রজোগুণ ও সত্ত্বগুণকে দাবিয়ে, তমোগুণ যে জীবের উপর প্রাধান্য

করে সেই জীবকে তামসিক জীব বলে। রাজসিক জীব গঠনশীল, সাত্ত্বিক জীব রক্ষাশীল, আর তামসিক জীব ধ্বংসশীল। রাজসিক জীব সর্ব্বদাই উৎসাহী, নূতন নূতন গঠনে সর্ব্বদাই ব্যস্ত! মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারিটি তত্ত্ব লইয়া অন্তঃকরণ তৈয়ারী হয়। রাজসিক জীবের অন্তঃকরণ গঠনমূলকভাবপ্রধান। ঐ রাজসিক অন্তঃকরণ যে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়কে পরিচালন করিয়া থাকে, তাহারাও রাজসিক ভাবাপন্ন। কাজেই রাজসিক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক - ইহারা সর্ব্বদাই রুচিসম্পন্ন। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের ন্যায় ইহারা গতানুগতিক রক্ষণশীলভাবে চলিতে চাহে না। প্রতি মুহূর্ত্তে ইহারা নূতন নূতন ভাবের সৃষ্টি করতে চায়। উহারা আজ যাহা দেখিল, কাল্ তাহাতে আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আবার একটা নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে চাহে। এইরূপ খাইতে বসিতে চলিতে হাসিতে শুনিতে বলিতে আবার খাওয়াইতে বসাইতে চালাইতে হাসাইতে শুনাইতে বলাইতে সর্ব্বদা একটা নিত্য নূতন ভাবের সৃষ্টী করতে চায়, প্রতি হাবভাবেই একটা মর্য্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকতে চায়।

শিষ্য—আর যদি রাজসিক জীব দরিদ্র হয়?

গুরু—হলেই বা দরিদ্র। রাজসিক জীব পর্ণকুটীরে বাস করিলেও তাহারা তাহার মধ্যেই যতটা সম্ভব আহারে বিহারে বসনে ভূষণে গৃহনির্ম্মাণে সামাজিক ব্যবহারে একটু জাঁকজমক, একটু পারিপাটা, একটু চাকচিক্য, একটু মার্জ্জিত রুচিসম্পন্নভাব লইয়াই দিবারাত্র ব্যস্ত আছে। রাজসিক জীব কঠোর পরিশ্রমী, রজোগুণপ্রধান দ্রব্যই আহার করে। মৎস্যমাংস প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য খাইয়া

থাকে। ঈশ্বরোপাসনায় ঐ সকল দ্রব্যই জাঁকজমকের প্রভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যবহার করে। কাজেই রাজসিক জীবের পূজোপচার ভোগরাগ সর্ব্বদা রুচিসম্পন্ন, মর্য্যাদাযুক্ত ও উৎসবময়।

শিষ্য—তামসিক জীব কি উৎসবময় পূজার অনুষ্ঠান করে না?

গুরু—তামসিক জীবের গতিবিধি, চরিত্র, জীবনপ্রণালী ঠিক ঠিক অনুধাবন করা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা সব সময় সম্ভব হয় না। স্বভাবত: তামসিক জীব উচ্ছৃঙ্খল, রাজসিক জীবের মধ্যে যেমন একটা শৃঙ্খলা আছে, মর্য্যাদাবোধ আছে, তামসিক জীব ঐ সবের ধার ধারে না। ভেঙ্গে ফেলাই তার স্বভাব, অপরিণামদর্শিতাই তার ভঙ্গিমা। অনিয়মগুলিই তার নিয়ম। সে বন্ধুত্ব ক'রে রাখতে পারে না, অর্থ উপায় ক'রে সঞ্চয় জানে না, দান ক'রে কেড়ে লয়। কেহ ক্রন্দন করিলে সে হাসিয়া ফেলে, কেউ হাস্‌লে সে হয় ত কেঁদে ফেলে। অমিতাচার আহার, অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বর উপাসনা, দর্পদম্ভভরা বাক্যালাপ, গুরুজনকে অপমান, শাস্ত্রবিধি বড় একটা মানে না—ইহাই তামসিক জীবের কর্ম্মপদ্ধতি। এক কথায় তামসিক জীব শৃঙ্খলা ছিঁড়ে ফেল্‌তে চায়, সাজান বাগান পাগলা হাতীর মত ভেঙ্গে চুরমার করতে চায়।

শিষ্য—সত্যই গুরুদেব! তামসিক জীব ধ্বংসশীল—ইহা সমাজের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক।

গুরু— কিন্তু বৎস, আমি তা স্বীকার করি না। ধ্বংস না থাকিলে যেমন উৎপত্তি হয় না, তামসিক জীব না থাকিলে রাজসিক বা সত্বিক জীবের উদ্ভব হতে পারে না। মূল নীতি ভুলিও না বৎস,

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্র মিলন না হইলে এই দৃশ্যমান জগতের সত্তা উপলব্ধি হবে না।

শিষ্য— গুরুদেব! ঐ যে বলিলেন—তামসিক জীব দান ক'রে কেড়ে লয়, উহা কি দানপদবাচ্য?

গুরু—তামসিক জীব যখন কিছু দান করে, তখন বুঝতে হবে, তাহার মধ্যে যে একটু অল্প সত্ত্বগুণ আছে, সেটার প্রভাবেই দান করে ফেলে, তখন অবশ্যই উহা দানপদবাচ্য। কিন্তু সত্ত্বগুণ তাহার মধ্যে অধিক না থাকায় সেই দান করা টুকু অধিকক্ষণ ধরে রাখতে পারে না, তমোগুণের আধিক্য বলেই সেইটুকু সত্ত্বর ভেঙ্গে ফেলে, কাজেই কেড়ে না নিলে দানকরাটুকু কি করিয়া ভাঙ্গা যায়। ঐরূপ কেড়ে নেওয়া খোটা দেওয়া, বাহাদুরী দেখান অথবা অনুতাপভোগ করা দানকেই তামসিক দান বলে।

শিষ্য— গুরুদেব, সাত্ত্বিক দানই ত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গুরু—হাঁ বৎস! সাত্ত্বিক দানের তুলনা নাই। সাত্ত্বিক জীব যাহাকে কিছু দান করেন, সেই গ্রহীতার নিকটই কৃতজ্ঞ থাকেন।

শিষ্য— গ্রহীতার নিকট কৃতজ্ঞ থাকেন কেন?

গুরু—সাত্ত্বিক জীব মনে করেন—গ্রহীতা দয়া করিয়া দানগ্রহণ না করিলে দাতার উৎপত্তিই হয় না। গ্রহীতা দাতৃত্বের জনক। সন্তান যেমন জন্মদাতা পিতাকে শ্রদ্ধা করেন, দাতা তেমনি গ্রহীতাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবেন। ইহাই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান। রাজসিক দান—মর্য্যাদাসম্পন্ন গৌরবময়, সমাজের কল্যাণ কারক, প্রশংসা ও যশোগানপূর্ণ বলিয়া সর্ব্বদা উৎসাহবর্দ্ধক।

শিষ্য—রাজসিক, সাত্ত্বিক ও তামসিক জীবের স্বরূপটী আপনার

কৃপায় বেশ বুঝলাম, কিন্তু গুরুদেব! একই ব্যক্তির মধ্যে কখন সাত্ত্বিক ভাব, কখন রাজসিক ভাব, আবার কখন তামসিক ভাব প্রবল দেখি কেন? ঐরূপ ব্যক্তিকে সাত্ত্বিক বলিব কি রাজসিক কি তামসিক বলিব অনেক সময় ঠিক করা কঠিন হয়।

গুরু— হাঁ বৎস, ঐ টুকু বুঝিয়া লইবার চেষ্টা কর। কোন ব্যক্তির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সাত্ত্বিক গুণ আছে, আটচল্লিশ ভাগ তামসিক গুণ আছে, মনে কর দুই ভাগ রাজসিক গুণ আছে। এইরূপ ব্যক্তির রক্ষণশীল ভাব, আর ধ্বংসশীল ভাব প্রায় কাছা কাছি সমান ওজনের। কাজেই ঐ ব্যক্তিটীর মধ্যে দুইটী গুণ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যখন সাত্ত্বিক ভাব তামসিক ভাবকে দাবিয়ে দিচ্ছে—তখন ঐ ব্যক্তিটী সত্ত্বগুণের প্রভাবে বহু সৎ কার্য্য করিয়া থাকে, আর যখন তামসিক ভাব তার সাত্ত্বিক ভাবকে দাবিয়ে দেয়, তখন ঐ ব্যক্তিটী সব ভেঙ্গে চুরমার করতে চায় জনত্রাস হয়ে ওঠে। এই ভাবে চলিতে চলিতে যখন যে গুণটী একটু বেশী প্রবল হয়, অন্যগুণগুলি পেছিয়ে পড়ে, আর দাবাইতে পারে না, তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী গুণটীরই প্রভাব চলতে থাকে। এই তিনটী গুণের অংশ বিশেষের ন্যূনাধিক্যে সাত্ত্বিক জীবগণের মধ্যে অগণিত পার্থক্য, রাজসিক জীবদের মধ্যেও ঐরূপ অসংখ্য ভেদ, আর তামসিক জীবদের মধ্যেও ঐরূপ অনন্ত কোটী পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এইরূপ অনুপাত হিসাব করিয়া লইও, বুঝিবার কোথাও কোন অসুবিধা হবে না। তখন মানুষের স্বভাব বা কাজ দেখলেই বুঝিতে পারিবে—তার ভিতর তিনটী গুণের মাত্রা কিভাবে খেলা করিতেছে।

শিষ্য— কেন ঐরূপ গুণভেদের সৃষ্টি হয় ?

গুরু— তাঁর ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাকে কেহ প্রকৃতি বলেন, কেহ শক্তি বলেন, কেহ মায়া বলেন, কেহ কারণ বলেন, কেহ লীলা বলেন। আরও কত লোকে কত কি বলেন।

শিষ্য— আপনি উহাকে কি বলেন ?

গুরু— আমি ঐ ইচ্ছাকে সবই বলি। যখন ভেদসৃষ্টি দেখি, তখন উহাকে কারণ বলি। যখন জীবের কর্তৃত্বাভিমান দেখি, তখন উহাকে অর্থাৎ 'আমি'র ইচ্ছাকে প্রকৃতি বলি। যখন দ্বৈত-বুদ্ধিতে জীব ছুটাছুটী মারামারি করে, শোক তাপ দুঃখ করে, তখন ঐ ইচ্ছাকে মায়া বলি। এইভাবে ঐ 'আমি' কতকাল ধরিয়া কত লীলাই করছেন।

শিষ্য—কতকাল এই লীলা চল্‌ছে গুরুদেব ?

গুরু—কেউ জানে না। কাল মানে সময়, সময় মানে কাল এইভাবে বুঝিলে কাল শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা কোনদিন বুঝিবে না।

শিষ্য— আপনী দয়া ক'রে বুঝিয়ে দিন।

গুরু—"পরিণতিজ্ঞাপকঃ কালঃ"। পরিণতি অর্থাৎ সক্রিয়ভাব জানিয়ে দেন যিনি, তিনি কাল। ব্রহ্ম অব্যক্ত ছিলেন; নিষ্ক্রিয় ছিলেন; কালও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ক্রিয়া না চলিলে কালকে বোঝা যায় না, আবার কাল ব্যক্ত না হ'লে ক্রিয়া চলেনা। কাল কতকাল ব্যক্ত হ'য়েছেন, তা কালই জানেন। কাল অসীম ক্রিয়ার দ্বারা তাঁর প্রকাশ। কতকাল প্রকাশ থাকবেন, তা তিনি জানেন, কতকাল অপ্রকাশ থাকবেন, তাও তিনি জানেন।

এই যে সক্রিয় জগৎ চলেছে, কাল একদিন ইহাকে গুটাইয়া লইবেন, তখন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা কেহ থাকিবে না, কাজেই কতখানি বেলা হইল, ইহা দিন কি রাত, কিছুই বোঝা যাবে না। মাস পক্ষ তিথির জ্ঞান হবে না,—এই সব পরিণতি যখন থাকে না, কাল তখন অব্যক্ত থাকেন। কোন দিন তিনি ব্যক্ত হবেন—কি দিয়া তাঁহার মানদণ্ড ঠিক করা হবে।কালকে যখন ধরা যায় না কাজেই তখন তাঁর বয়স কত কি ক'রে ঠিক ক'রব, বাবা। আমরা যেমন বৎসর বুঝিতে চাই,—মাসের গতি লক্ষ্য করিয়া কালকে বুঝিব কারগতি লক্ষ্য করিয়া। এইজন্য এই জগদ্ব্যাপার অনাদি অনন্ত। কতবার ডুবছে, কতবার জাগছে, কেউ বলতে পারে না। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কারণাতীত কতভাবেই এই জগৎ লীলা চলেছে। প্রত্যেক স্থূলের পিছনে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের পিছনে কারণ, কারণেরপিছনে অব্যক্ত নিরাকার ব্রহ্ম কারণাতীত ভাবে রয়েছেন। যতই অনুধ্যান করিবে আনন্দে আপ্লুত হইবে।

[শিষ্য—]এই যে পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ আমরা দেখছি—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা জল আগুন আকাশ, বাতাস, আমরা রয়েছি—এর সূক্ষ্ম কারণভাব কি?

গুরু— অব্যক্ত ব্রহ্ম যখনই বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন, ভূমানন্দে যখনই প্রকাশিত হইতে চাহিলেন, তখনই ঐ যে বহু হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট গুণান্বিত "আমি" বা তাঁর ইচ্ছা, উহাই এই পরিদৃশ্যমান জগতের অনন্তকোটি কারণ রূপে প্রতিভাত! ঐ ইচ্ছাই সৃষ্টি স্থিতি লয়ে অগণিত কল্পনারূপ সূক্ষ্মাকার গ্রহণ করিল। সেই ইচ্ছাপ্রসূত সূক্ষ্ম কল্পনাগুলি ক্ষিতি অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম

ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ভিতর দিয়া গুণভেদে অনন্ত স্থূল রূপের সৃষ্টি হইল। তাহলেই দেখ,—এই জগদ্ব্যাপারের কারণ—তাঁর ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাপ্রসূত বিভিন্ন কল্পনাগুলি সূক্ষ্ম ভাব, আর ঐ কল্পনাপ্রসূত সূক্ষ্মভাবগুলিই বহুরূপে মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে—ইহা স্থূলভাব। আরও বুঝিয়া দেখ - তোমার সম্মুখে একখানি প্রাসাদ, উহা একটী পঞ্চভূতের স্থূলভাব, ঐ প্রাসাদটী নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে একটী পরিকল্পনা ছিল—উহাই প্রাসাদের সূক্ষ্মভাব। ঐ পরিকল্পনার পূর্ব্বে যাঁর প্রাসাদ তাঁর একটা ইচ্ছা হ'য়েছিল—উহাই প্রাসাদের কারণভাব।

শিষ্য— গুরুদেব, আপনার কৃপায় বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এখন নিঃসন্দেহে সাহস ক'রে বল্‌তে পারি—তাঁর ইচ্ছারূপ 'কারণ'টী ত্রিগুণান্বিত বলিয়া সূক্ষ্মভাব ও স্থূলভাবগুলিও গুণান্বিত হইয়াছে।

গুরু—হাঁ বৎস, যেখানে যেরূপ সৃষ্ট বস্তু পরিদর্শন কর না, কারণে গুণভেদ থাকিলেই তার কার্য্যে গুণভেদ থাকিবে। যেমন একখানি বস্ত্র, ইহা একটী স্থূলরূপ। উহার সূক্ষ্মরূপ,—কয়েক হস্ত পরিমিত সূতা; ঐ সূতার কারণ রূপ,—কতকটা তুলা। অর্থাৎ তুলা হইতে সূতা, সূতা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বস্ত্রখানির স্থূলরূপ সৃষ্টি করিয়াছে। আবার ঐ তুলাতে গুণভেদ থাকায় অসংখ্য জাতীয় তুলা আছে। যেমন 'তাঁর' ইচ্ছা অসংখ্য জাতীয়। ঐ তুলায় ভেদ থাকায় সূতাতে সরুমোটা টেকসই রূপে অসংখ্য ভেদ আছে। আবার ঐ বিভিন্ন জাতীয় সূতার স্থূলরূপ হইতে বিভিন্ন জাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা যতরকম বস্ত্র দেখি না উহার মূল কারণ ঐ রকমারী তুলা। এইরূপ আমরা যতরকম সৃষ্টি

বৈচিত্র দেখি না কেন উহার মূল কারণ 'তাঁর' রকমারি ইচ্ছা।

শিষ্য—হাঁ গুরুদেব, সুন্দর বুঝলাম,—আমরা যতরকম রূপ ধারণ করি না কেন, যতভাবেই ভাবান্বিত হই না কেন, উহার মূল কারণ— 'তাঁর' ইচ্ছা। অনন্তকোটী গুণভেদে ঐ ইচ্ছাই পরিকল্পনাসহযোগে স্থূলরূপে প্রকটিত। কিন্তু ইহা আমরা সর্ব্বদা লক্ষ্য করি না।

গুরু—ঠিক বলেছ বৎস, আমরা যখন একখানা বস্ত্র ব্যবহার করি, অথবা সুচিক্কণ বস্ত্রনির্ম্মিত রাজার উষ্ণীষ বা মহারাণীর পরিচ্ছদ নিরীক্ষণ করি, তখন উহার ক্ষণভঙ্গুর বাহ্য চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়াই অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকি। কিন্তু তখন ভাবিবার অবসর পাই না—ঐ বহুমূল্য পরিচ্ছদের মূল কারণ—কেজাতীয় তুলা বা রেশম। এইরূপ সর্ব্বত্র সৃষ্টির প্রত্যেক ছোট বড় সব কিছুই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-রূপ-ভাবত্রয়ে, অন্বিত বা অনুস্যূত।

শিষ্য—গুরুদেব, ঐ যে 'আমি' বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন, উহার কারণ কি?

গুরু—উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলেই—কারণাতীত অব্যক্ত অবস্থায় আসিয়া পড়িবে। ঐ কারণের কারণ হচ্ছেন 'অব্যক্ত ব্রহ্ম'।

শিষ্য—তাহলে আমরা জগতে যাহাকিছু ভাল মন্দ দেখছি সবই ত' তাঁরই রূপ। তিনি সৎ অসৎ সর্ব্বত্রই ত' রূপ গ্রহণ করেছেন?

গুরু—এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? 'তাঁর' ইচ্ছারূপ প্রকৃতিই যখন বিশ্বের রূপ গ্রহণ করেছেন, তখন শুভ অশুভ সুন্দর

কুৎসিত সবই তিনি। তিনি কোথাও মলিন মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, পথের ধারে ব'সে ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও ব'লে করুণ কণ্ঠে চিৎকার করছেন—আর তাঁরই উজ্জ্বল সাত্ত্বিক মূর্ত্তি দাতারূপে ভিক্ষা দিচ্ছেন। কোথাও 'তাঁর'ই তামসিক মূর্ত্তি মদ্যপানে উন্মত্ত হ'য়ে 'তাঁর'ই সাজান সংসার ধ্বংস করছেন। আবার কোথাও 'তাঁর'ই রাজসিক মূর্ত্তি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভাঙ্গা সংসার গ'ড়ে তুলছেন, কোথাও তাঁর অত্যুগ্র তমোগুণ উৎপীড়ক রূপে শান্তিময় জনপদ শ্মশানে পরিণত করছে, আর কোথাও 'তাঁর' অভিনব রজোগুণ সেই পূতীগন্ধময় শ্মশানকে মনোহর নগরে পরিণত করছে। এরূপ কোথাও তিনি সুন্দর পক্ষীরূপে মুক্ত গগনে উড়ে বেড়াচ্ছেন, আবার তিনিই হিংস্র ব্যাধরূপে ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে ঐ উড্ডীয়মান নিরীহ পক্ষীটিকে হত্যা করবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এইভাবেই লীলাময়ের ইচ্ছায় জগৎ লীলা চ'লছে। এইরূপ গুণভেদে রূপভেদ যতই চিন্তা করিবে, বৎস, ততই সেই বিশ্বমূর্ত্তির চরণে প্রণত হবে—আর বলবে—

> "বহুবাহু, বহুমুখ, অনেক উদর,
> আছে নেত্র বহুতর, অন্তহীন মনোহর,
> তব রূপ এবে আমি হেরি বিশ্বেশ্বর,
> আদি-অন্ত-মধ্য যার না হয় গোচর॥"

গীতা—১১।১৬

মায়া

শিষ্য— গুরুদেব, আপনার কৃপায় গুণভেদের কারণে যে রূপের ভেদ হয়, তা বেশ বুঝলাম। সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম 'আমি' রূপে এই বিশ্বের কারক। তিনি কখন করণ সম্প্রদান, আবার কখন অপাদান অধিকরণ রূপে বিরাজ করছেন। কিন্তু কি তাঁর অত্যাশ্চর্য্য লীলাবৈচিত্র!

গুরু— হাঁ বৎস, তিনি নিজেকে এমন ঢেকে ফেলেছেন—যার মূলে আমরা এক হলেও, অভিন্ন হলেও বাহ্যতঃ আমরা প্রত্যেকে পৃথক। কর্ত্তা, কর্ম্মকে চেনে না, আবার কর্ম্মও কর্ত্তাকে চেনে না। যেন পরস্পর চির অপরিচিত।

শিষ্য—এর কারণ কি গুরুদেব? শত শতবার উপদেশ পেলেও মনপ্রাণ ঐ ভেদবুদ্ধির অতীত হ'তে চায় না। ভাষায় বুঝলাম, তর্কযুক্তিতেও বুঝলাম—সর্ব্বত্র তিনি,—জল স্থল আকাশ বাতাস জীব শিব সবই তিনি; তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নাই। কিন্তু আমার ঘরে যিনি আছেন যাঁকে নিয়ে আমি ঘর করি, তিনি ত' মেনে নেন না। মুখে তিনি সহস্রবার বলেন—"খল্বিদং ব্রহ্মই" কাণে তিনি সহস্রবার ঐ কথাই শোনেন। তথাপি একটী পুত্রের মৃত্যু হলে, কিম্বা বিষয় সম্পদ বিপন্ন হলে সব বিশৃঙ্খল হ'য়ে যায় কেন গুরুদেব? আমি জানি—আমার পুত্র কন্যা প্রতিবেশী

পিতা মাতা শত্রু বন্ধু সব আমরা এক, কিন্তু কৈ কার্য্যক্ষেত্রে ত' প্রমাণিত হইল না। ইহার কারণ কি গুরুদেব? একটী ধাক্কা আমি শিশুর মত অসহায়, একটু সম্ভ্রমে আঘাত পেয়ে আমি দিশেহারা,—আমি প্রতিশোধ নিতে ছুটেছি—আমি নিজের মাংস নিজে কামড়ে খাবার উল্লাসে অধীর। কে সে দুর্জ্জয়া শক্তি গুরুদেব?

গুরু—বৎস, উহারই নাম মায়া। ঐ যে বস্ত্রখানি প্রস্তুত হয়েছে, তুলাগুলি মায়ার পাকে পাক খেয়ে নিজের মৌলিক সত্ত্বা ভু'লে গিয়ে ভিন্ন রূপে ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করেছে। ঐ মায়াই,—লীলাময়ের লীলাময়ত্ব। মায়া আছেন ব'লেই তিনি ব্যক্ত আছেন, নতুবা অব্যক্ত হ'য়ে যেতেন। মায়া আছেন ব'লেই সত্তা মিথ্যা সঙ্কল্প বিকল্প আছে। মায়া আছেন ব'লেই পৃথক জীবে পৃথক পৃথক কর্তৃত্ববোধ। তাঁর বহু হইবার ইচ্ছারূপ প্রকৃতি মায়ারূপে সর্ব্বত্র ভেদের সৃষ্টি করেছেন। গীতায় তিনি বলেছেন—অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। জীবভাব যখন অহঙ্কারে বিমূঢ় হন, জীব তখনই নিজেকে কর্ত্তা মনে করেন। প্রকৃত জীব কর্ত্তা নহেন। মূল আমিকে ভুলিয়ে দেয়, তাকে বলি মায়া। আমি কর্ত্তা এই বোধে ঘিরে রাখে কায়া॥

শিষ্য—গুরুদেব, কোন উপায়ে ঐ মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

গুরু—তুলা যে মায়ার পাকে পাক খেয়ে সূতা হইয়াছে, উল্টা পাক দিলেই অর্থাৎ ধুনে ফেল্‌লেই ঐ সূতা মায়ারূপ পাকমুক্ত হ'য়ে তুলারূপে ফিরে আসবে। যন্ত্রপরিচালনরূপ কর্ম্মপ্রণালীর

য়ারা ধূনারি যখন ছিন্ন বস্ত্রগুলি ধূনিতে থাকে। তখন ঐ স্ত্ররূপী সূতাগুলি কি বলিতে থাকে জান?

শিষ্য—না গুরুদেব!

গুরু—উহারা বলিতে থাকে—'ধাঁই ধুঁই তুঁহু'। অর্থাৎ সূতাই ই আর বস্ত্রই হই, তুমি তুলাই চিরসত্য। ঠিক ঐরূপ—আমি হু হইব—এই ইচ্ছা গুণভেদে রূপভেদের পাক খেয়ে বহু আমির ষ্টি হইল। ঐ বহু আমি কেহ মনুষ্য কেহ অশ্ব কেহ মাতঙ্গ কহ পতঙ্গ—কতভাবেই পৃথক পৃথক কর্ত্তৃত্বের বিলাস নিয়ে মানন্দের স্রোতে ছুটেছে। ইহারা যখন বহুত্বের আনন্দে আর তৃপ্ত হতে পারে না; ভিন্ন কর্ত্তৃত্ববোধ যখন জ্বালাময় হয়ে উঠে তখনই বহুত্ব হইতে একত্বের দিকে মুখ ফিরায়।

শিষ্য—এ বড় কঠিন ব্যাপার গুরুদেব, কি ভাবে মুখ ফিরাবে।

রু—বস্ত্রগুলি যেমন ধুনারীর হাতে পড়ে তুঁহু ডাক্ ছেড়ে, তাহার ৌলিক রূপ তুলায় সমাহিত হয়, তেমনি বহুত্বের আনন্দে অতৃপ্ত াব অর্থাৎ নিত্যনূতন গঠনকার্য্যে বীতরাগ ক্লান্ত জীব গুরূপদেশ-প পরিচালন প্রণালীর দ্বারা ধূনিত হয়ে তুমিই সত্য, তুমিই র্ত্তা, এইরূপ তুঁহু ডাক ডাকিতে অভ্যাস করে। 'আমি' 'আমি' রিয়া যেমন বহুরূপ আমি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সেই রূপকে 'তুমি' 'তুমি' করিয়া ঐ 'আমি' সেই মূল আমিরূপ লিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। ভিন্ন কর্ত্তৃত্ববোধ তিরোহিত । জীব মায়ামুক্ত হয়। যতটুকু কর্ত্তৃত্ববোধ তিরোহিত হয়, াও ততটুকু তিরোহিত হয়।

য্য—ভিন্ন কর্ত্তৃত্ববোধ কি ভাবে তিরোহিত হয়?

গুরু—তাঁকে পেতে হয়। তিনি বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ইহার অর্থ :— দৈবীগুণময়ী মায়া এই যে আমার
অতিক্রম করে ভবে সাধ্য আছে কার ?
কর্ম্মযোগে আমাকেই লাভ করে যারা,
দুস্তরা মায়ার মাত্র পার পায় তারা।

গীতা ৭।১৪

শিষ্য—বুঝলাম, তাঁকে লাভ করতে পারলেই ভিন্ন কর্ত্তৃত্ববোধ তিরোহিত হয়, দুস্তর মায়া হতে জীব মুক্ত হয়। কিন্তু তাঁকে লাভ করবার উপায় কি গুরুদেব ?

গুরু—সে কথা তিনি পরমদয়ালরূপে ব্যক্ত করেছেন—ঐ শোন তাঁকে লাভ করতে হ'লে, মায়ামুক্ত হ'তে হ'লে কি উপায় অবলম্বন করতে হয়।

আমাতেই রাখ চিত্ত মম ভক্ত হও,
নমস্কার কর মোরে, উপাসনা লও,
এইরূপ আমাতে হ'লে সমাহিত মন,
নিশ্চয় আসিয়া আমি দিব দরশন। গীতা ৯।৩৪

শিষ্য—ঐ যে গীতায় শ্রীভগবান উপাসনা লইবার উপদেশ দিয়াছেন, যার অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে এবং যাঁকে পাওয়া গেলে জীব মায়ামুক্ত হতে পারেন, সেই উপাসনার স্বরূপ কি ? সে উপাসনা কি ভাবে অনুষ্ঠান করতে হয় ?

গুরু—বৎস, উপাসনা শব্দের অর্থ, সমীপে বসা, ঈশ্বরের নৈকট্য

লাভ করা, যে সমস্ত উপায়ের দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়ভাবোধ দৃঢ় হয়, তাহাই উপাসনা। ঐ উপাসনা দ্বিবিধ—অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। স্তবস্তুতি, পূজা, জপ, হোম, ধ্যান ধারনা, সমাধি এইগুলি অন্তর্মুখী উপাসনা। ইহা বিধি বোধিত ও গুরূপদিষ্ট হওয়া চাই।

শিষ্য—আর বহির্মুখী উপাসনা কাহাকে বলে গুরুদেব, ইহা আমার বড়ই অভিনব বলে মনে হচ্ছে।

গুরু—একটুও অভিনব নয়। সাধক বহির্মুখী উপাসনায় অভ্যস্ত হয় না বলেই, অন্তর্মুখী উপাসনা তেমন প্রাণারাম করে তুলতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহের কর্ম্মগুলির মধ্যে তাঁর কর্তৃত্ব উপলব্ধি করাই বহির্মুখী উপাসনা। অন্তরে নিয়মিত ঈশ্বরের ধ্যান, বাহিরে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি। এই ভিতর বাহিরের কাজ যখন ঈশ্বরমুখী হয়ে সমভাবে চলতে থাকে তখনই প্রকৃত উপাসনার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। নতুবা ভিতরে লক্ষ লক্ষ জপাদি চলছে, বাহিরে একটু কিছু ক্ষতি হলে এমনকি একটি পয়সার একটু এদিক ওদিক হলে, অস্থির হয়ে পড়ে, ফলে ভিতরে যে ভাবটুকু অঙ্কুরিত হচ্ছিল, বাহিরে জল সিঞ্চনের অভাবে শুকিয়ে যায়।

শিষ্য—কি ভাবে কর্ম্ম করিলে, জীবের দৈনন্দিন কর্ম্মগুলি ঈশ্বরমুখী হয়, দয়া করিয়া বলুন।

যোগস্থ।

গুরু—শ্রীভগবান স্বয়ং সে কথা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে, স্বধর্ম্মে বীতরাগ ভীত বিহ্বল চিত্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'যোগস্থ কুরুকর্ম্মাণি' যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। সেইরূপ কর্ম্মেই মায়ার বাঁধন শিথিল হয়, বন্ধনবোধ তিরোহিত হয়, সত্যদর্শন ঘটে, জীবন্মুক্তি হয়। যে 'আমি' বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া জগদ্ব্যাপারে ছড়িয়ে রয়েছেন, সেই খণ্ড খণ্ড আমি মূল 'আমি'র স্বরূপ উপলব্ধি করে পরমানন্দে নিত্য সমাহিত হয়।

শিষ্য—গুরুদেব, কর্ম্মই ত বন্ধনের কারণ দেখছি! 'আমি' বহু হইব—এই ইচ্ছারূপ কর্ম্মের দ্বারাই সেই 'আমি' বহুভাবে বন্ধন প্রাপ্ত হয়েছেন। তবে কর্ম্মানুষ্ঠানে কি ভাবে বন্ধন মুক্তি হবে?

গুরু—জান ত বৎস, কর্ম্মকে বাদ দিয়া কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। মায়ামুক্তি বা বন্ধনমুক্তিরূপ কার্য্যটী সিদ্ধ করতে হলেই কর্ম্ম করতেই হবে। এইজন্য কর্ম্মত্যাগের উপদেশ কোথাও নাই। যিনি আজ শত্রু, ব্যবহার গুণে তিনিই আবার মিত্র হন। কারণে দোষ থাকিলে, কার্য্যও দোষযুক্ত হয়; আবার কারণ দোষশূন্য হলেই কার্য্যও দোষশূন্য হয়। আরও দেখ, কর্ম্ম ত্যাগ করান উদ্দেশ্য হলে বীতরাগ অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান

বৈরাগ্যের পোষকতায় উপদেশ দিতেন। ত্যক্তোত্তিষ্ঠ ধনঞ্জয় বলিয়া ঐরূপ নিষ্ঠুর বিভৎস যুদ্ধকর্ম্মে প্রবৃত্ত করতেন না।

শিষ্য—হিন্দু ধর্ম্মের চরম আদর্শ কি গুরুদেব?

গুরু—হিন্দুধর্ম্মের চরম আদর্শ পরমানন্দ লাভ করা। যে আনন্দ লাভ করলে, জাগতিক আর কোন আনন্দে আকৃষ্ট হ'তে হবে না; যাকে পেলে জগতের আপেক্ষিক লাভ ক্ষতিতে উল্লসিত বা অভিভূত হ'তে হবে না, সেইরূপ বোধাত্মক—আনন্দই হিন্দু-সন্তানগণের চরম ও পরম লক্ষ্য। যাহা যাহার পক্ষে অধিকারী হিসাবে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে। কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানই হিন্দুর বিধিবোধিত কর্ম্ম এবং হিন্দুর প্রাণের ধর্ম্ম। শ্রীমান্ অর্জ্জুন শক্তিমান ক্ষত্রিয় ছিলেন অন্যায়ের প্রতিকার, ন্যায়ের মর্য্যাদা দান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পৃষ্ঠে সমাজের প্রতি স্তরে মিথ্যা শঠতা, প্রবঞ্চনা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চনা, স্ত্রীজাতির অবমাননা—এইগুলি অত্যুগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফুটিয়া উঠেছিল। মানব কল্যাণের জন্য ঐ গুলির শমতার ভার তৎকালে ক্ষত্রিয়ের ছিল। ঐগুলি ঐ সময়ে প্রশমিত না হইলে আজ মানব সমাজ বলিয়া তার কিছু চিহ্ন থাকিত না। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ মনে করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে শ্রীমান্ অর্জ্জুন মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে, কে বাঁচিল, কে মরিল, দেখিবার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। ভারত বীরশূন্য হইল, কি বিধবা নারীকুলের মর্ম্মফাটা ক্রন্দনে আকুলিত হইল, তাহা তাঁহার বিচার্য্য ছিল না। কর্ত্তব্য সম্পাদনই তাঁর ছিল

স্থির লক্ষ্য।

শিষ্য—ঐ কর্ত্তব্যটী সম্পন্ন করতে গিয়ে বীর বরেণ্য অর্জ্জুন সমাজের অনেক ক্ষতিও ত' করেছিলেন ?

গুরু—তা হ'য়েই থাকে বৎস ! বিষবৃক্ষ উৎপাটনই যখন কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হবে, তখন সেই বৃক্ষের পতন চাপে ছোট ছোট কত গাছ, কত কীট পতঙ্গ, পিপালিকা পিষ্ট বিনষ্ট হবে, সে চিন্তায় আকুল হলে বিষবৃক্ষ কোন দিনই উৎপাটন করা চল্‌বে না।

শিষ্য—কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করা একটী কঠিতম কাজ। ক্ষত্রিয় জাতি কঠোর, তাঁদের পক্ষে হয়ত সম্ভাপর হইল ; গৃহস্থধর্ম্মেও কি ঐরূপ কর্ত্তব্য সম্পাদনে কঠোরতা আছে ?

গুরু—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিলে, তুমি যত কঠোর মনে করিতেছ, তত কঠোর নহে। বিপদে, বিষাদে, প্রমাদে, প্রসাদে গৃহে, অরণ্যে সর্ব্বত্রই যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। তুমি গৃহস্থ ; তোমার পুত্র-কন্যা প্রিয়জন পীড়ায় আক্রান্ত, হয়ত বা জীবন সংশয় অবস্থায় উপনীত। এ অবস্থায় তোমার কর্ত্তব্য, তোমার অবস্থা মত তাদের চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষা, সর্ব্ব অনুরাগটুকু দিয়া তাদের নিরাময় করা তোলা। যদি তাঁরা নিরাময় হয়ে যান, জগৎ কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দাও। আর যদি তাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হন, যে [illegible] উৎসাহ নিয়ে চিকিৎসা চল্‌ছিল, যে অন্তরটুকু নিয়ে তাদের [illegible]মুক্ত করবার চেষ্টা চল্‌ছিল, ঠিক ঠিক সেই সবটুকু নিয়ে তাদের মৃতদেহ সৎকার করতে হবে, সেই উৎসাহ ব্যঞ্জক [illegible] সমস্ত মূর্ত্তি নিয়ে, সেই

অক্লান্ত অনুরাগ নিয়ে অন্তর দিয়ে তাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্ম যথাশক্তি সমাধা করতে হবে। কাহারও মৃত্যুতে ব্যথিত হলে চল্‌বে না, কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অবসন্ন হলে চল্‌বে না। এগুলি বহির্ম্মুখ উপাসনা বীরের মত নির্ভীক হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে কর্ম্ম করতে হবে। ইহাই গীতোক্ত 'কুরু কর্ম্মাণি' মহাবাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। এইভাবে যিনি কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম্মী।

শিষ্য—গুরুদেব, বুঝলাম—কর্ত্তব্যে স্থির লক্ষ্য রেখে অবিচলিত অব্যথিত অক্লান্ত যিনি হতে পারেন, তিনিই কর্ম্মী। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, কোনটা আমাদের কর্ত্তব্য, কোনটা অকর্ত্তব্য, এ বিচার, বিষয়মুখী মোহাচ্ছন্ন জীবকে কে করাইয়া দিবে। বিভিন্ন প্রকৃতির লোক তাহাদের কর্ত্তব্য বিভিন্ন, আচার অনুষ্ঠানও বিভিন্ন, সংস্কারও বিভিন্ন। সময় সময় এমন সংশয়-সংকুল-দোলায়মান অবস্থা আসিয়া পড়ে, জীব ঠিক করিতেই পারে না কোনটি তার কর্ত্তব্য, কোনটি অকর্ত্তব্য। সে বেচারীর ইচ্ছা থাকিলেও, বাছিয়া লইতে পারে না—কোনটা তার করণীয়, কোনটা অকরণীয়। মহাবীর অর্জ্জুনের মত ব্যক্তিকেও, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে—স্বধর্ম্ম পালনে পুণ্য, গুরুজন বধে পাপ. এইরূপ কর্ত্তব্য-বিচার-সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। এখন দয়া করিয়া বলুন, সাধারণ ব্যক্তি কি ভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে।

গুরু—ঠিক ঠিক কর্ত্তব্য বাছিয়া লওয়া কঠিন সমস্যা। সবচেয়ে নিরাপদ উপায় নিজ নিজ গুরূপদিষ্ট হয়ে চলা।

শিষ্য—কিন্তু সকলের পক্ষে সকল সময় গুরূপদেশ লাভ করা

সম্ভব নয় গুরুদেব।

গুরু—বেশ, তাহলে শোন, কর্ত্তব্য বলি তাহাকে, যাহা শাস্ত্র-বিহিত-কর্ম্ম।

শিষ্য—শাস্ত্র বলি কাহাকে গুরুদেব!

গুরু—ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ, মানব সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যে সমস্ত উপদেশ দিয়া গেছেন এবং ধর্ম্ম ও লোকরক্ষার অনুকূল যে সমস্ত বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তন ক'রে গেছেন, সেই সমস্ত ঋষিবাক্যের একবাক্যতা বা মতসমন্বয় যাহা—তাহাই শাস্ত্র। ব্যক্তিবিশেষ ঋষির বিরুদ্ধবাক্য শাস্ত্র নহে। হিন্দুর কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনে পার্থক্য নাই। দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভিতর দিয়েই ধর্ম্ম অনুষ্ঠীত হয়। তাই হিন্দু জন-সাধারণের সাংসারিক কর্ম্মনিয়ামক যে শাস্ত্র তাহাই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র। মোটামুটি এমন কোন কাজ করিতে নাই, যাহার অনুষ্ঠানে জীবভাব অবনমিত হয়। জীব-ভাবের উৎকর্ষ সাধনই ধর্ম্ম।

শিষ্য—বুঝলাম। কিন্তু গুরুদেব, সকল সময় সকল অবস্থায় শাস্ত্রমত জেনে নেবারও ত' অবসর থাকে না। এমন সঙ্কটপূর্ণ মুহুর্ত্ত হ'তে পারে, যখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে সে অবস্থায় কর্ত্তব্য নির্ণয়ের উপায় কি?

গুরু—ঠিক বলেছ বৎস, আমি পূর্ব্বেও তাই বলেছি যে কর্ত্তব্য-নির্ণয় একটি কঠিন সমস্যা। সেইজন্য শ্রীভগবান্ যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

শিষ্য—যোগস্থ হওয়া কাহাকে বলে, তাহার স্বরূপ কি?

গুরু—যোগে যিনি থাকেন, তাহাকেই যোগস্থ বলে।

শিষ্য :—যোগ কাহাঁকে বলে ?

গুরু :—বহু গ্রন্থে যোগ শব্দের বহু ব্যাখ্যা হ'য়ে গেছে। পূর্ব্ব-ঋষিগণ যোগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি। একীকৃত্যবিমুচ্যেত যোগোহয়ং মুখ্য উচ্যতে॥ ইহার অর্থ—মনটীকে বৃত্তিহীন করিয়া, অর্থাৎ কোন বিষয়ান্তরে মনটী যাতে না যায়, মনের অবস্থা সেইরূপ করিয়া নিজের প্রাণটীকে বা জীব-ভাবটীকে পরমাত্মার সহিত অর্থাৎ মূল আমির সহিত একভাবাপন্ন করিলেই যোগ করা হয়, ইহাই মুখ্যযোগ নামে কথিত।

শিষ্য :—ইহাই যদি মুখ্য যোগ হয়, গৌণ যোগ কাহাকে বলে ?

গুরু :—পূর্ব্ব-ঋষিগণ মুখ্যযোগের যে লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা পাইতেছি দুইটী মিলনের নাম,—যোগ। সাধারণ যে কোন দুটী বস্তু বা ব্যক্তির যে মিলন, তাহাই গৌণযোগ। জীবভাব আর ঈশ্বরের যে মিলন, তাহাই গৃহস্থের মুখ্যযোগ। যোগস্থ হইয়া কার্য্য করিলে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না, পাপ-পুণ্যের অতীত এক পরমানন্দ অবস্থায় যোগস্থ জীব উন্নীত হয়। তাই শ্রীভগবান্ গৃহস্থ অর্জ্জুনকে ঐরূপ নির্ম্মম লোমহর্ষণ দুষ্কর যুদ্ধকার্য্যে যোগস্থ হইয়া করিতে বলিয়াছিলেন। আর শ্রীমান্ অর্জ্জুন যোগস্থ হ'তে পেরেছিলেন বলেই কোটী কোটী নরহত্যা করিয়া অগণিত নিরপরাধ রমণীগণের অকাল-বৈধব্য ঘটাইয়াও তিনি নিষ্পাপ, নিরপরাধ এবং জীবন্মুক্ত।

শিষ্য :—আপনি যে বলিলেন গুরুদেব, জীবভাব ও ঈশ্বরের মিলনের নাম মুখ্যযোগ ; আবার আপনি পূর্ব্বেই বলেছেন, গুণভেদে রূপের ভেদ হয়, সুতরাং জীবভাবে ও ঈশ্বরে অনন্তকোটী ভেদ বিদ্যমান রয়েছে, কিরূপে ইহার মিলন সম্ভব ? আবার দুইটী যদি একগুণ একরূপ না হয়, তা'হলে মিলনের অভাবে যোগস্থ হওয়াই

বা কিরূপে সম্ভব হয়। আপনি কৃপা করিয়া একটু পরিষ্কার করুন, নতুবা অজ্ঞ সন্তান কিরূপে বুঝিবে।

গুরু :—উত্তম কথা। আমি পূর্ব্বেই বলেছি—যোগ শব্দের অর্থ দুইটীর মিলন। একযুক্ত এক, সমান দুই। এই দুইটী একের মিলনে উৎপন্ন দুইএর যেমন পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নাই, অথচ ঐ দুইএর মধ্যে দুইটী একেরই পৃথক্ পৃথক্ গুণ ও রূপ আছে, ঠিক সেইরূপ একটী জীবভাবযুক্ত একটী ঈশ্বরভাব মিলিত হইয়া উভয়ের মধ্যে এককর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, তাহাই মুখ্যযোগ। যেমন দুইটী মনুষ্য আসিতেছে বলিলে, মনুষ্য দুইটীর গুণ, রূপ এক বুঝায় না, উহাদের আগমন-ক্রিয়া একসঙ্গেই মিলিত হইয়াই হইতেছে, পৃথক পৃথক হইতেছে না এইটীই বুঝায়। সেইরূপ জীব যখন নিজ অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বময় বিরাট কর্ত্তৃত্বে নিজ সীমাবদ্ধ কর্ত্তৃত্বটুকু মিশাইয়া দেয়, তখনই জীব যোগস্থ হন।

শিষ্য :—এ বড় কঠিন সমস্যায় ফেল্‌লেন গুরুদেব! ভাগ্যবান অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, তিনি যোগস্থ হতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে বায়স্কোপ দেখার মত ঐভাবে বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভবপর কি?

গুরু :—না বৎস, তিনি নিজেই বলেছেন—ভক্ত হও, তাহলেই সম্ভব। ঐ শোন—

"আমাতেই একনিষ্ঠা ভক্তি হয় যার,
সেইজন জানে হেন স্বরূপ আমার,
সেই মাত্র মোরে, পার্থ দেখিবারে পায়,
ভক্তিবশে অবশেষে প্রবেশে আমায়।" গীতা ১১।৫৪

শিষ্য :—বুঝলাম গুরুদেব; তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির পর গীতায়

ঐ যে সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে সমত্ব জ্ঞান, বাস্তবক্ষেত্রে কিরূপে সম্ভব হয়? যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীমান্ অর্জ্জুন শত্রুবক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন, লক্ষ্যে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, নতুবা শত্রু নিহত হইত না। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথবধে তাঁর কঠোর প্রতিজ্ঞাও ছিল, অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদের জন্য অত্যুগ্র ব্রহ্মাস্ত্রও নিক্ষেপ করেছিলেন, এরূপক্ষেত্রে শ্রীমান্ অর্জ্জুনের সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে সমত্ব জ্ঞান কিরূপে প্রমাণিত হয়? গীতা শ্রবণের পর, বিশ্বরূপ দর্শনের পর তাঁর কার্য্যাবলী সাধারণ ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্য্যের সহিত তুলিত করা যায়। তাহলে অর্জ্জুনের প্রতি গীতোক্ত উপদেশ, অপরূপ বিশ্বরূপ প্রদর্শন, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা, এ সব কি উপকথার ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে না?

গুরু :— না বৎস। অর্জ্জুন প্রকৃতই যোগস্থ হইয়া তাঁর সমস্ত জীবনের কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তুমি যোগ শব্দের যেভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছ, উহা সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য। ভাব্য-ভাবুকয়োরেকবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ ধ্যাতা, ধ্যেয় এক হয়ে যাওয়া। সত্যই ইহার পর আর কর্ম্ম থাকে না। সন্ন্যাসীগণ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঐভাবেই যোগস্থ হন। উহা কেবল অন্তর্মুখী যোগ, উহা কর্ম্মনিরাসক যোগ। কিন্তু গীতায় 'যোগস্থ কুরুকর্ম্মাণি' যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর— এই উক্তির দ্বারা কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং কর্ম্ম করিতে হইলেই কর্ত্তৃত্ববোধ, কর্ম্মে অনুরাগ, আসক্তি, ফললাভের আকাঙ্ক্ষা, এগুলি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা চলে না। কাজেই গৃহস্থের পক্ষে যে 'যোগ' তাহা কর্ম্মসহজাতক যোগ। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে— শ্রীভগবান নিজে গৃহস্থরূপে আবির্ভূত, বীরবরেণ্য শ্রীমান্ অর্জ্জুনও গৃহস্থ, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা গৃহস্থের পক্ষেই প্রযোজ্য। নতুবা যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার অবসর কোথায়?

শিষ্য :—ঐ যে কর্ম্ম-সহজাতক যোগ বলিলেন, উহার অর্থ কি ?

গুরু :—প্রতি কর্ম্মেই ভগবানের সঙ্গে তাঁর কর্ত্তৃত্বের যোগ রেখে চলিলেই ঐ কর্ম্মগুলি কর্ম্মসহজাতক যোগ হইবে। ইহা দেখিতে বহির্মুখী হইলেও অন্তরের সহিত সম্বন্ধ আছে। সন্ন্যাসীগণ কর্ম্মত্যাগী, গৃহস্থগণ কর্ম্মী, সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিও।

শিষ্য :—উভয় যোগের লক্ষ্যস্থল ত একই ?

গুরু :—হাঁ বৎস, কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণ মনটীকে বৃত্তিহীন করিয়া যোগস্থ হন, গৃহস্থগণ মনটীকে মাত্র পৃথককর্ত্তৃত্ববোধরূপ-বৃত্তিহীন করিয়া যোগস্থ হন ; অন্যান্য বৃত্তিগুলি থাকিয়া যায়। নতুবা কর্ম্ম করিবার শক্তি থাকে না। উভয়ের অনুষ্ঠানে মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ হয়। তথাপি শ্রীভগবান্ গৃহস্থের পক্ষে প্রযোজ্য যে যোগ তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করে গেছেন। কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ গৃহস্থ সাধক যখন যোগস্থ হন, তখন তিনি ভক্তরূপেই নিজ কর্ত্তৃত্ববোধ ভগবানে অর্পণ করেন। তখন ভক্ত ভগবানের এতই নৈকট্য লাভ করেন, ভগবান এতই ভক্তের নিকটতম আত্মীয় হয়ে যাঁন যে, ভক্ত তাঁর প্রত্যেক কার্য্যটী ভগবানের কার্য্য বলেই মনে করে নেন। ভক্ত নিজের পৃথক্-কর্ত্তৃত্বের যে তামসিক আস্বাদ তখন আর উপভোগ করেন না। তখন তিনি প্রত্যেক অবস্থাটীকে ঈশ্বর-প্রেরিত অবস্থা বলেই মনে করে লয়েন। তখন তাঁর দৈনন্দিন প্রতি কার্য্যের সঙ্কল্প, বিকল্প, আসক্তি, অনাসক্তি, ফল, অ-ফল, সিদ্ধি, অসিদ্ধি, সবই শ্রীভগবানের লীলা, সবই তাঁর ইচ্ছা, সবই তাঁর কর্ত্তৃত্ব, এইরূপ মনে করে লয়েন। ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, তিনিই বুদ্ধিরূপে, বৃত্তিরূপে, সর্ব্বরূপে আমার মধ্যে অবস্থান করছেন—এই দৃঢ়বিশ্বাসে উপনীত হওয়ার নামই যোগস্থ হওয়া। শোন বৎস, শ্রীভগবান্ গীতায় কি বলছেন,—

'আমাতে অর্পিত চিত্ত হইবে যাহার,
দুস্তর সংসার-দুঃখ-রূপ-পারাবার।
অনায়াসে পার সেই হবে ধনঞ্জয়,
দম্ভে না শুনিলে বাক্য মরিবে নিশ্চয়। গীতা ১৮।৫৮

শিষ্য:—গুরুদেব, আপনি একটু পূর্ব্বেই বলেছেন—কর্ম্ম করতে হলেই কর্ত্তৃত্ববোধ, কর্ম্মে অনুরাগ প্রভৃতি থাকা চাই, আবার এখন বলছেন—নিজ কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরকে অর্পণ করতে পারলেই সাধক যোগস্থ হ'তে পারবে। কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করলে সাধকের পক্ষে কর্ম্ম করা কিরূপে সম্ভব হয়? কর্ত্তাই ত' ক্রিয়া সম্পাদন করে। কর্ত্তা না থাকলে কে কর্ম্ম করিবে গুরুদেব? ✓

এককর্ত্তৃত্ববোধই যোগ।

গুরু: বৎস, আমি ঠিকই বলে যাচ্ছি। বহু পূর্ব্বে বলেছি—দুইটী মিলনের নামই যোগ। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আর তোমার কর্ত্তৃত্ব, এই দুইটী কর্ত্তৃত্বের মিলন ঘটাও।—তাহলেই এককর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। তোমার অসীম কর্ত্তৃত্বটুকু যদি ঈশ্বরের অসীম কর্ত্তৃত্বে অর্পণ না কর, তোমার ক্ষুদ্র কলসীর জলটুকু যদি সাগরের জলে ঢেলে না দাও, তাহলে কি করে মিলন হবে, কি করে যোগ হবে। তোমার ক্ষুদ্র কর্ত্তৃত্বটুকু অর্পণ করলে, তুমি কর্ত্তৃত্বহারা হয়ে পড়ছ না, বরং তুমি বিরাট কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হচ্ছ। তখন তুমি তোমার জন্মজন্মার্জ্জিত প্রকৃতি বা সংস্কারের বশে যা কিছু কর্ম্ম করে যাচ্ছ, ঐ সবগুলিই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই বোধ জাগ্রত হবে। তখন তুমি অর্জ্জুনের মত সমুদয় কর্ম্ম করেও নিজস্ব কর্ত্তৃত্ববোধ না থাকায় নিজস্ব কর্ম্মফলের বোধও থাকবে না। তোমার কর্ত্তৃত্ববোধ যতই সঙ্কীর্ণ হবে, কর্ম্মফলের বোধও ততই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে তোমাকে

আবদ্ধ করবে। এইরূপে ঈশ্বরের সহিত এককর্তৃত্ববোধযুক্ত হলেই তোমার নিজস্ব বলে কিছুই থাকতে পারে না। নিজেকে পৃথক কর্তা মনে করলেই তাঁর সঙ্গে বিয়োগ হয়ে যায়, আর এককর্তৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হলেই যোগ হয়ে যায়। মূলে এই বিরাট বিশ্ব তাঁর সঙ্গে সর্বদাই যোগযুক্ত, আমরা পৃথক কর্তৃত্বের বিলাস নিয়ে নিজেই বিযুক্তবোধে সরে দাঁড়িয়েছি।

শিষ্য :— ঈশ্বরের সঙ্গে যে সব সাধকের এককর্তৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদের দেখে বাহিরের লোক কি ঠিক ধরতে পারে?

গুরু :—যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরাই ধরতে পারেন—সাধারণ লোকে কি উপায়ে ধরবে? পুতুল নাচ দেখেছ? মনে কর, যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে এককর্তৃত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যোগস্থ হয়েছেন—তাঁরা পুতুল। আর যাঁরা নিজেদের পৃথক কর্তা মনে করেন তাঁরা দর্শক অজ্ঞান শিশু। শিশুরা দূর থেকে ঐ পুতুল নাচ দেখে মনে করে—ঐ পুতুলটা বেশ নাচছে, বেশ যুদ্ধ করছে, ঐটা তেমন কায়দা জানে না, ঐটা হেরে গেল, ঐটা জিতে গেল, ইত্যাদি। সেই শিশুরা জানে না—ভিতরে একটা লোক পুতুলটাকে ঘাড়ে করে যেমন তালে তালে পা ফেলে নাচছে, উপরের পুতুলটাও ঠিক সেইরূপ ভঙ্গিমা করে নাচ দেখাচ্ছে। নীচে একটা আবরণ দেওয়া থাকে, তাই ভিতরের প্রকৃত নাচিয়েটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই মনে হচ্ছে, উপরের পুতুলটাই শূন্যে নেচে বেড়াচ্ছে। সাধারণের চোখের সামনে পৃথক কর্তৃত্বের অভিমানরূপ একটা আবরণ রয়েছে, তাই ভিতরের মূল কর্তাকে দেখতে পাচ্ছে না। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা ভিতরের সংবাদটা রাখেন, কঠোর সাধনাবলে পুতুল হয়েছেন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা নিজের কর্তৃত্বে নাচছেন না, কাজেই তাঁরা মায়ামুক্ত যোগস্থ হ'য়ে জীবন্মুক্তি লাভ করেছেন

শিষ্য :—আমার মনে হয়, সাধারণের পক্ষে এরূপ সাধনায় উপনীত হওয়া অসম্ভব গুরুদেব।

গুরু :—স্বয়ম্ভুর জগতে অসম্ভব বলে কিছু নাই বৎস।

শিষ্য :—তবে অসম্ভব কথাটী সৃষ্টি হয়েছে কেন গুরুদেব ?

গুরু :—উহা অধিকারীভেদে প্রযোজ্য। তোমার কাছে যাহা অসম্ভব, অন্যের কাছে তাহা সম্ভব। মোট কথা শোন বৎস, অভ্যাসে সবই সম্ভব। নিজ নিজ আশ্রমগত আদর্শ হইতে অনেকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন অনেক গৃহস্থ মামুলী সাধন-ভজন করিয়াও উন্নত হইতে পারিতেছেন না, আবার অনেক সন্ন্যাসী বা অবধূত লক্ষ্যভ্রষ্ট উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া সমাজ-চক্ষে ত্রাসের সৃষ্টি করছেন। অনেক গৃহস্থ 'দ্বৈতবোধে' প্রতিষ্ঠিত না হয়েই হঠাৎ 'অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান' জোর করে মুখের ভাষায় লাভ করেন, অথচ পরিবারের পীড়াটী একটু কঠিন হলেই মুখ শুখিয়ে কুলের আঁটি হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে শিক্ষা-দীক্ষা না দিয়া পুত্রাদি বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই বিবাহ দেওয়া হয়, যার ফল বর্ত্তমান সমাজে বিষময় হয়ে উঠেছে ; তেমনি গৃহস্থ আশ্রমে থেকে 'দ্বৈতবুদ্ধিতে' সিদ্ধিলাভ না করেই, এমন কি ঈশ্বর আছেন, এই বিশ্বাসে উপনীত না হয়েই সামান্য আঘাতেই গৃহত্যাগ করা, ঘুরিতে ঘুরিতে তথাকথিত প্রজ্ঞাবুদ্ধির ক্ষতিকারক সন্ন্যাসীগণের আশ্রমরূপ ফাঁদে পা দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা মুণ্ডন করে গেরুয়া পরে নমো নারায়ণ হয়ে যাওয়া, ইহার পরিণামও ঠিক তেমনি বিষময়। পূর্ব্বেই বলেছি, আশ্রমগত অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়, অভীষ্ট লাভ হয় যিনি যে আশ্রমে আছেন, তিনি সেই আশ্রমের উদ্দেশ্য লক্ষ্য, আদর্শ ও করণীয় কি তা ভালবাবেই জেনে নেবেন। আদর্শ ঠিক হলেই চলতে সুবিধা হবে, এদিক ওদিক আর সময় নষ্টও হবে না।

শিষ্য :—গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের আদর্শ কি ?

গুরু :—গার্হস্থ্য আশ্রমে সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করতে হয়। তা না করতে পারলেই আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মেরুদণ্ড হচ্ছে, 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' একথা অনেকেই জানেন। স্ত্রীর সহিত একসঙ্গে ধর্ম্ম আচরণ করার স্বরূপটী কি, তাহা বোধহয় অনেকেই অবগত নহেন। গৃহস্থের পক্ষে প্রথমতঃ স্ত্রীর সহিত যোগস্থ হবার উপদেশ বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গৃহস্থ ঋষিগণ অকুণ্ঠভাষায় কীর্ত্তন করে গেছেন এবং যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ দানও করে গেছেন। বিবাহের সময় তোমরা মাত্র মুখে বল, তা অনেকক্ষেত্রে অন্যমনস্কভাবে,—"মম হৃদয়ং তব হৃদয়ং ভবতু" ইত্যাদি কিন্তু কোনদিনই তোমরা অনেকেই স্বামী-স্ত্রীর দুইটী হৃদয় এক করে ভাবতে চেষ্টা কর না। অথচ 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' একথা বহুবারই আভিধানিক পণ্ডিতের মত সময় অসময় উচ্চারণ করে থাক।

শিষ্য :—আপনি ঠিকই বলেছেন গুরুদেব, ব্যক্তিগত সাধনা-বিহীন আভিধানিক পণ্ডিতের সংখ্যা সমাজে দিন দিন বেড়েই চলেছে। এখন দয়া করে বলুন - স্ত্রীর সহিত কি উপায়ে যোগস্থ হওয়া সম্ভব ?

গুরু :—গার্হস্থ্য-আশ্রমে ধর্ম্মপত্নীই যোগপীঠ। যদি কোন গৃহস্থ সাধক সৌভাগ্যক্রমে নিজ ধর্ম্মপত্নীর সহিত যোগস্থ হতে পারেন, তাহলে অজানা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগস্থ হ'তে তাঁর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হয় না। দুইএর মিলনের নামই যোগ;—এই মূল সত্য সর্ব্ববিধ যোগেই অনুস্যূত—একথা ভুলিও না। সংসারে স্বামী ও স্ত্রীর দুইটি পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব মিলিত হইয়া এককর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলেই সেই যোগ হয়, যে যোগ ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ায় আভিজাত উভয়ের কামজ দৈহিক মিলনের মধ্যেই যে যোগ হয়,

তাহাই চরম মিলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হয়। বিবাহকালে এইজন্যই 'কামস্তুতি' পাঠের ব্যবস্থা আছে।

শিষ্য :—যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একমত না হতে পারেন, তাহলে কি উপায়?

গুরু :—চিন্তা করিয়া দেখ বৎস, প্রত্যেক সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান বা বিযোগ বা তফাৎ কোথায়? ব্যবধান বা বিযোগটুকু উঠাইয়া দিলেই আপনা হইতেই যোগ হয়ে যাবে। উভয়ের মতের অমিলনই ব্যবধান বা বিযোগ। এখন বল দেখি—কেন মতের অমিল হয়? মত শব্দের অর্থ—মনন, চিন্তা, ভাবধারা ইত্যাদিই বুঝায়। ঐ সব মনন চিন্তা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির মূলে একজন কর্ত্তা আছেন, তিনি না থাকলে ঐগুলির উৎপত্তিই হয় না। ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তাই বিভিন্ন মনন, বিভিন্ন ভাবধারার সৃষ্টি করে থাকেন; কাজেই মতভেদের উৎপত্তি হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রবল চেষ্টায় প্রথমতঃ নৈকট্য সৃষ্টি করে নিতে হয়। তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা এইগুলি সরল ও সহজ হইয়া থাকে। নিজ নিজ শ্রীগুরুদেবের নিকট ইহার রহস্য জানিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। উভয়ে একই পথে চলিতে চলিতে, একই মন্ত্র জপিতে জপিতে একটীই মতবাদের সৃষ্টি হয়। তখন উভয়ে একটী বোঁটায় দুইটী ফুলের মত একই বাতাসে দোলে, হাসে, আবার ঝরে পড়ে। তখন দুইএর মধ্যে দুইটী কর্ত্তৃত্ব থাকে না। দুইটী কর্ত্তৃত্ব মিশিয়া এককর্ত্তৃত্বেরই প্রতিষ্ঠা হয়। তখন স্বামী-স্ত্রী যোগস্থ হন। তখন উভয়ের অন্তঃকরণ এমন এক সমসূত্রে অনুস্যূত হয়, একের চোখ দেখিয়া অন্যের মনোভাব বোঝা যায়। স্বামী এইরূপ সমর্পিত কর্ত্তৃত্ব হইয়া সাধিকা স্ত্রীর সহিত 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই ঋষি-বাক্যের স্বরূপতা ফুটিয়ে তোলেন। প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তখনই হয়, যখনই স্বামী-স্ত্রী ঐরূপ যোগস্থ হন।

শিষ্য :—তা বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু স্ত্রী যদি অবাধ্য হয়, গুরুদেব, তাহলে স্বামী কিরূপে যোগস্থ হতে পারেন ?

গুরু :—দেখ বৎস, হিন্দু নারী আবহমানকাল থেকে 'পতিঃ পরমো গুরুঃ' এই ঋষি বাক্য অন্তরের সহিত সবক্ষেত্রে না হ'লেও সামাজিকভাবে অনেক স্থলেই মেনে আসছেন। হিন্দু সমাজে স্ত্রীকে তৈরী করে নেবার ভার সেই বৈদিক যুগ থেকে স্বামীর উপর অর্পিত হয়ে আসছে। 'বরায় কন্যাং দদ্যাৎ' এই যে বেদবাক্য, ইহাকে বরায় অর্থে, শ্রেষ্ঠায় এইরূপই ব্যাখ্যাত হয়েছে। কন্যাকে বিবাহ করিয়া শিক্ষা দেবার ভার বরের। যদি কেহ বিবাহ করেই আত্মসংযমী হয়ে স্ত্রীকে আদর্শমুখী করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন, আমার বিশ্বাস, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবেন। কিন্তু যদি কেহ বিবাহ করেই সংযমের নৌকা থেকে লাফ মেরে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে লক্ষ্যহীন গতিতে ছুট্‌তে থাকেন, তখন তিনিই নাকানি চোবানি খেয়ে অতীষ্ঠ হবেন, কিছুদিন পরে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বেন, তখন তিনি নিজেই অসামাল, স্ত্রীকে কেমন করে সামলাবেন। ভিতরে সংযম না থাকলে বাহিরের ভাবাতেও সংযম রক্ষা করা যায় না। কাজেই ধর্ম্মপত্নীকে গালাগালি মারামারি সব কিছু করেও শান্তি হয় না। অথচ অসংযমের ক্ষুধা মিটাতে দৈহিক মিলন বাদ পড়ে না। ঐরূপ পশুভাবাপন্ন অবস্থায় যে সব পুত্র-কন্যা উৎপন্ন হয়, তাহারাও পশু হয় ; তাদের দ্বারা দেশের, দশের, সমাজের কোন মঙ্গলও হয় না বরং ধর্ম্মের ও সমাজের ক্ষতিই হয়।

শিষ্য :—বেয়াড়া নারীর মন পাওয়া বড় কঠিন সমস্যা গুরুদেব। কি উপায়ে নারীর মন পাওয়া যায় দয়া করে বলুন।

গুরু :—ওগো গোপাল, মন পেতে হলেই মন দিতে হয়। তোমার সমস্ত মনটা পবিত্র করে, নিখুঁত করে, আত্মভোলা করে,

কোনদিন কি তোমার স্ত্রীকে অর্পণ করেছ? যদি করে থাক, নিশ্চয়ই তারও মন পেয়েছ। যতটুকু নিখাদ মন তাকে দিয়েছ, ততটুকু নিখাদ মন নিক্তির ওজনে নিশ্চয়ই পেয়েছ। তোমার স্ত্রী যদি মনে-প্রাণে বুঝতে পারে, তুমি তার সম্মুখে মিথ্যা বল না, ওগো, সেও কোনদিন তোমার সম্মুখে মিথ্যা বল্‌তে সাহস পাবে না। এইরূপে তোমার ভালবাসা, আদর, যত্ন, স্নেহ-মমতা সকল ব্যাপারেই বুঝিয়া লইও। তোমার তাড়নায়, তোমার শাসনে, তোমার চীৎকারের ভয়ে তোমার স্ত্রী যেটুকু তোমাকে সেবা করে থাকে, সে সেবা প্রাণের সেবা নয়। তাড়না বা শাসন ইহা রাজনীতির ধর্ম্ম বা প্রাথমিক গঠনের সহায়ক। ইহাতে প্রভুত্ব বিস্তার হয় বটে, কিন্তু ইহাতে প্রাণারামের দর্শন পাওয়া যায় না, প্রেমানন্দের স্পর্শও ঘটে না, যোগস্থ হবারও কোনদিন সম্ভাবনা থাকে না। মোট কথা তুমি যা দিবে, তাই পাবে; যতটুকু দিবে, ততটুকু পাবে। 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি'—দাও এবং গ্রহণ কর, ইহাই চিরন্তনী নীতি।

শিষ্য :—বেশ বুঝ্‌লাম, বড় আনন্দ পাচ্ছি গুরুদেব, এখন বলুন,—মোটামুটি কিভাবে স্ত্রীকে গঠন করতে হয়?

গুরু :—শুভ-বিবাহের পর হতেই গুরুদায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হয়। সেই সময় হইতেই নিজে সংযত হয়ে, নিজে আদর্শমুখী হ'য়ে, স্ত্রীকে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী মনোরমারূপে গঠন করে নিতে হয়। একই পথে চল্‌তে চল্‌তে পবিত্র স্বামী দেবতার নিরত সংসর্গে স্ত্রীর মতটাও এক হয়ে যায়। ঈশ্বরের কৃপালাভ করবার উদ্দেশ্যে গুরূপদেশে দীক্ষিত হ'তে হয়। দীক্ষা উপনয়নের মতই একটা সাধন-পথের সংস্কার। উভয়কে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হয়—ইহাই এক পথে একই উদ্দেশ্য নিয়ে চলা আরম্ভ। তারপর সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজকর্ম্মে সুবিধা অসুবিধাগুলি পরস্পরের মধ্যে বৈ চৈ

চীৎকার না করে আপোষে মীমাংসা করে নিতে হয়। দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। পরিণত বয়সেও চেষ্টার ফলে কতকটা অগ্রসর হওয়া যায়।

শিষ্য :—সকল অবস্থায় ইষ্টমন্ত্র জপ কিরূপে সম্ভব হয় গুরুদেব ?

শিষ্য :—পূর্ব্বেই বলেছি, অভ্যাসে সবই সম্ভব। দর্শনে স্পর্শনে চৈব গমনে-শয়নে তথা। ভোজনে মৈথুনে দেবি জপেন্মন্ত্রং নিরন্তরম। ইহাই তন্ত্রোক্ত সাধনা। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়ে মহামন্ত্র জপ করতে হয়। শুচি ও অশুচি দুই সতীনের ভাব হয়ে গেলেই কোথাও আর অভাব থাকে না। ঐরূপ উভয়ের মন্ত্রজপের ফলে এক পথে চলতে চলতে অভ্যাসের অপরিসীম প্রভাবে উভয়ে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, তখন চেষ্টা না করলেও আপনা আপনি জিহ্বামূলে জপ হতে থাকে; আর উভয়ের মনের মিল হতে থাকে অথচ সাংসারিক কোন কার্য্য-সম্পাদনে কোনরূপ বিশৃঙ্খলাও ঘটে না। তখন উভয়ের দুটী প্রাণ পরমানন্দলহরের একটী বিন্দুতে হিল্লোলিত হতে থাকে। সে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় যোগস্থ অবস্থা। যাঁরা যোগভ্রষ্ট, তাঁরাই এইরূপ সর্ব্বত্র শুচিসম্পন্ন পবিত্র যোগস্থ পিতা মাতার নিকট আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

শিষ্য :—ঐরূপ যোগস্থ পিতামাতারও কি কামভাব থাকে ?

গুরু :—বৎস, কামের একটী নাম 'মনোজ' বা 'মনসিজ'। মন যতক্ষণ থাকবে, তাতে কামও থাকবে। সংযত মন থেকে উৎপন্ন যে কাম, তাহাই জগতের কল্যাণকর। ধর্ম্মশীল স্বামী-স্ত্রীর এককর্ত্তৃত্ব-মূলক যে মন, সেই মন থেকে উৎপন্ন যে পবিত্র কাম, সেই কাম থেকে উৎপন্ন যে সমস্ত সন্তান, তাঁরাই ভুবনপাবন, বিশ্ববরেণ্য অবতার বা অবতার বিশেষ।

শিষ্য :—যাঁরা বিপত্নীক বা চিরকুমার, যাঁরা বিধবা বা

চির-অনূঢ়া, যাঁরা অনমনীয়া দুর্ব্বিনীতা, অথবা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর স্বামী তাঁরা কি উপায়ে যোগস্থ হবেন?

গুরু :—তাঁরা বৈধভাবে যে কোন উপায়ে যে কোন একটীর সহিত কর্ত্তৃত্ব মিলাইতে অভ্যাস করিবেন। দীক্ষাগুরু, পিতা, মাতা, শ্বশুর, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নি কতই রয়েছেন, ইঁহাদের মধ্যে যাঁকে ভাল লাগে, যে কোন একটীর সহিত কর্ত্তৃত্ব মিলাইতে অভ্যাস করুন। একস্থানে নিজকর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মিলাইতে পারিলেই অন্যত্র উহা মিলান আরও সহজ হয়ে যায়। এইভাবে যিনি বহুকর্ত্তৃত্বে অর্থাৎ গণকর্ত্তৃত্বে নিজ কর্ত্তৃত্ব মিশাইয়া দিতে পারেন, তিনিই গণেশ-পদবাচ্য হন। গণকর্ত্তৃত্ব আর বহুরূপে বিরাজমান বাসুদেব-কর্ত্তৃত্ব ইহাতে মোটেই ভেদ নাই। নিজকর্ত্তৃত্বে ও বাসুদেব কর্ত্তৃত্বে যিনি এক দেখেন, তিনিই ত সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর, তাঁর আর বাকি থাকল কি? ওগো, ভিতরের ব্যাপারটী হচ্ছে এই, মানুষের সবচেয়ে অশান্তিদায়ক শত্রু হচ্ছেন—নিজকর্ত্তৃত্বের অভিমান। মানুষ বাড়ী-ঘর, বিষয়-বৈভব সব ছেড়ে নেঙটী পরেও মহাত্মা বোনেও কর্ত্তৃত্ব ছাড়তে পারে না। একটু কর্ত্তৃত্বে আঘাত লাগলেই দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়। এইজন্য পূর্ব্বেই বলেছি, কর্ত্তৃত্বই মায়া, কর্ত্তৃত্ববোধ নিয়ে মৃত্যু হয় বলেই পুনর্ব্বার জন্ম হয়। কর্ত্তৃত্ব সংস্কারগুলি ধরে রাখে, তদনুকূল জন্মান্তর পরিগ্রহণ করে। কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করা বড় সহজ নয়। সংসারে যত কিছু অশান্তি, মতবৈষম্য সবই কর্ত্তৃত্বের লড়াই। এই যে মহাসমর চলেছে, শত শত সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি জনপদ ধ্বংস হচ্ছে, সহস্র সহস্র স্নেহময়ী জননীর নয়নের মণি, লক্ষ লক্ষ নারীর একান্ত শরণ হৃদয়ভূষণ বীরগণ ধরাশায়ী হচ্ছে, এই যে কোটী কোটী লক্ষ কোটী অর্থ অপব্যয় হচ্ছে, যাহা পৃথিবীর দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দিলে দারিদ্র্য কিছুকাল নির্ব্বাপিত হত, ইহার মূলেও ঐ কর্ত্তৃত্বের অভিমান প্রভুত্বের লড়াই।

শিষ্য :—সত্যই গুরুদেব, কর্তৃত্ব ত্যাগ করা কঠিন সমস্যা। সাধারণের পক্ষে এ মোহ কাটানর কি উপায় ?

গুরু :—পূর্ব্বেই বলেছি, আবার বলছি—সাধারণ সাধকের পক্ষে কর্তৃত্বের মোহ কাটাতে হ'লে, প্রথমতঃ ধীরে ধীরে অতি নিকট প্রিয়জনকে ঐ কর্তৃত্ব একটু একটু করে দিতে হয়। কর্তৃত্ব অতি প্রিয়তম বস্তু, যাকে তাকে উহা দান করা যায় না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হয়েছে. ধর্ম্মপত্নীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাস গমনের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্য্যা। প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী'। এই আমাদের প্রিয় ভার্য্যা, প্রাণাপেক্ষাও গুরুত্ববিশিষ্ট। তাই ধর্ম্মপত্নীর কর্তৃত্বে নিজ কর্তৃত্ব একটু একটু মিশিয়ে দেওয়া কতকটা সম্ভব হয়। ইহাই গৃহস্থের পক্ষে সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ। নতুবা স্ত্রীর সঙ্গে মনে প্রাণে কর্তৃত্বের মিল নাই, অথচ কোন একটা বৈদিক কার্য্যে একসঙ্গে কোষায় হাত দিয়ে একটী সঙ্কল্প-বাক্য উচ্চারণ করে ফেল্লেই সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। ধর্ম্মপত্নীর সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজকর্তৃত্ব মিলাইয়া কাজ করা অনেকটা সহজ হয়, ঐভাবের অভ্যাসে একটা তৃপ্তিও হয়। এই বহির্ম্মুখী তৃপ্তিবোধ যখন তীব্র হয়ে উঠে, পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের পূজা, জপ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি অন্তর্ম্মুখী অনুষ্ঠানের প্রভাবে ভগবদ্বিশ্বাসও যখন মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠে, তখন ঐ অভ্যস্ত কর্তৃত্ব অর্পণটুকু ধর্ম্মপত্নীর ক্ষুদ্র আধার উপচে পড়ে ভগবানের বিরাট অসীম কর্তৃত্বে সমাহিত হয়ে থাকে। এইভাবে ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে সাধকের কর্তৃত্ববোধ যখন ভগবানে সমাহিত হয়, তখন সাধক যোগস্থ হন। সাধক এইভাবে যোগস্থ হইয়া ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় চালিত হইয়া এককর্তৃত্ববোধ লইয়া ছোট বড় যত কিছু কর্ম্মের ভিতর দিয়া চলিতে থাকেন। তার ফলে শোক-তাপ, দুঃখ-দৈন্যের অতীত

হইয়া জীবন্মুক্তির পরমানন্দত্ব লাভ করেন। তখন—আঘাতেতে পায় না ব্যথা, মরেনাকো অভিমানে। (রত্নাকর)

ব্রহ্ম-গায়ত্রী।

শিষ্য :—যোগস্থ হয়ে কর্ম্ম করবার উপদেশ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে দিয়েছিলেন, কিন্তু আরও পূর্ব্বযুগে লোকে কি যোগস্থ হয়ে কর্ম্ম করতেন না ?

গুরু :—নিশ্চয়ই করতেন। গীতা জন্মাবার বহু পূর্ব্বেও ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ ছিল। গীতায় যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাহাও অতি সুপ্রাচীন। কালপ্রভাবে সমাজ ব্রহ্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়েছিল, তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমাজকে সেই ব্রহ্মবিদ্যা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

শিষ্য :—প্রাচীনতম যুগে কিভাবে ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করা হত ?

গুরু :—হিন্দুধর্ম্মে ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, ভাবাতীত হওয়াই লক্ষ্য, পরিবর্ত্তিত ভাব লক্ষ্য নহে। বৈদিকযুগে সর্ব্ববেদসার গায়ত্রীর উপাসনা হত, এখনও কিছু হ'য়ে থাকে। সেই গায়ত্রী উপাসনার দ্বারাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হলেই এককর্ত্তৃত্ব-বোধ উৎপন্ন হয় ; আবার এককর্ত্তৃত্ববোধ উৎপন্ন হলেই ব্রহ্মবিদ্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যা আর এককর্ত্তৃত্ববোধ একই অবস্থা।

শিষ্য :—গায়ত্রী কাকে বলে গুরুদেব, তাঁর স্বরূপ কি ?

গুরু :—গানের দ্বারা যিনি ত্রাণ করেন, সেই সত্বরজস্তমোগুণময়ী ব্রহ্মশক্তিই গায়ত্রী। বৈদিকযুগে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ সর্ব্ববেদসার সেই গায়ত্রীর উপাসনা করতেন। অতি শিশুকালেই তাঁরা তাঁদের বংশধরগণকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করতেন।

শিষ্য :—উপনয়ন কাকে বলে গুরুদেব ?

গুরু :—'উপ' শব্দে সমীপ বা নিকট বুঝায়। 'নয়ন' শব্দে যাহার দ্বারা নিয়ে যাওয়া যায়। সুতরাং উপনয়ন শব্দে ইহাই বুঝিবে—এমন একটী সংস্কার যাহা ব্রহ্মসমীপে পৌঁছাইয়া দেয়, যাহার অনুশীলনে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়। সেই শিশু ব্রহ্মচারীগণ গায়ত্রীর অর্থ জানতেন না, কিন্তু তাঁরা ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া উদাত্তকণ্ঠে গায়ত্রীরূপ বেদমন্ত্রটী গান করিতেন। সেই অরুণোদয়কালে গুরুর কণ্ঠে শিশুগণের ললিতকণ্ঠে মিলিত হইয়া ঐ সর্ব্ববেদসার মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়া ভারতের আকাশ বাতাস ধূলিকণা পবিত্র করিত। তুমি নিজের পরিচয় যদি জানতে চাও বৎস, ঊষাকালে শয্যাত্যাগ করিয়া নির্জ্জন দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিও, শুনিতে পাইবে—এখনও সেই অবিনশ্বর ব্রহ্ম উপাসনা এখনও সেই শিশুকণ্ঠের ললিতধ্বনি শূন্যপথে ক্ষীণাতিক্ষীণ স্বরেও ভেসে আসছে।

শিষ্য :—গুরুদেব, সেই শিশুগণ গায়ত্রীর অর্থ জানতেন না, তবে কিভাবে উপাসনা করতেন ?

শিষ্য :—'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্র'ণাং বোধাদপি গরীয়সী'। তাঁরা বেদমন্ত্র আবৃত্তি করতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ আবৃত্তির ভিতর দিয়াই উহার অর্থ স্বতঃই উপলব্ধ হ'ত। বৎস, যান্ত্রিক উপাসনাই ব্রহ্মবিদ্যালাভের দ্বার ছিল। যান্ত্রিক উপাসনা—ঠিক যন্ত্রের মত অভ্যাস করে যাওয়া।

শিষ্য :—গুরুদেব, আমরাও অনেকেই গায়ত্রীর অর্থ জানি না, আবৃত্তিও করতে শিখি নাই। আপনি দয়া করে অর্থটা বলে দিন।

গুরু :—গায়ত্রীর অর্থ অতি বিস্তৃত। এখানে সংক্ষেপে উহার অর্থটী বলে দিচ্ছি। তোমরা মনে মনে মন্ত্রটী উচ্চারণ কর, আর অর্থটী মিলাইয়া লও। (যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করিয়া

থাকেন, যিনি পৃথিবী প্রভৃতি লোকসকলের জনক, যিনি সর্ব্ববরেণ্য মহাজ্যোতিস্বরূপ, আমি তাঁকে ধ্যান করিতেছি) শিশুকাল থেকে সে যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ এই একই মহাবাক্য অভ্যাস করিতেন। ইহাতে এই বোধই জাগ্রত হত, আমার বুদ্ধি আমি পরিচালন করি না, আমার বুদ্ধি যিনি পরিচালন করেন, আমি তাঁকে ধ্যান করিতেছি। এখন বিচার্য্য—আমার বুদ্ধি আমি যদি পরিচালন না করি, তবে আমার কর্ত্তৃত্ব কোথায়? অন্যের বুদ্ধিতে যদি আমি চলাফেরা ইত্যাদি সকল কর্ম্মই করি, তাহলে তিনিই ত' আমার কর্ত্তা। বুদ্ধিই ত' মনকে পরিচালিত করে থাকে, মনই ত' ইন্দ্রিয়কে পরিচালন করে। বুদ্ধি যদি আমি পরিচালন না করি, মনকে আমি কিরূপে পরিচালন করিতে পারি. সুতরাং ইন্দ্রিয় পরিচালনের মূল কর্ত্তৃত্ব আমার নয়। যদি কর্ম্মে আমার কর্ত্তৃত্ব না থাকে, কর্ম্মজনিত ফলেও আমার কর্ত্তৃত্ব নাই। আমি যন্ত্রীর যন্ত্র, বাদকের বাদ্য। তুমি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করায়, অন্তশ্চক্ষু না থাকায়, তুমি যদি যন্ত্রীকে বা বাদককে দেখ্‌তে না পাও, অথচ যন্ত্র বা বাদ্যের বাজনা শুন্‌তে পাও। তখন তুমি যন্ত্র বা বাদ্যেরই কৃতিত্ব দিবে। ইহাতে আর বিচিত্র কি? আর তুমি যদি যন্ত্রী বা বাদককে দেখ্‌তে পাও বা অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করতে পার, বুঝিব তুমি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছ, গায়ত্রী উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া সর্ব্ববিদ্যেশ্বর হইয়াছ।

শিষ্য :—ঐ যে বেদ-মন্ত্র-গায়ত্রী আবৃত্তি করিতে করিতে বলা হচ্ছে—'আমি তাঁকে ধ্যান করিতেছি'। আবৃত্তি আর ধ্যান কি এক জিনিষ?

গুরু :—না বৎস, আবৃত্তি আর ধ্যান এক জিনিষ নয়। আবৃত্তির দ্বারা ভাবের সৃষ্টি হয়, ধ্যান সেই ভাবটাকে ধরে রাখে।

শিশুগণ প্রথমতঃ আবৃত্তিই অভ্যাস করিত। তাহার পর আবৃত্তি ও ধ্যান উভয়ই করিত।

শিষ্য :—কিভাবে ধ্যান করতে হয়?

গুরু :—মেরুদণ্ড সোজা করে ও চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানে বসিতে হয়। ইহা ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে হয়। চঞ্চলসহস্রমুখী মনটাকে একমুখী করতে হয়। মন একমুখী হলেই উহা বুদ্ধি নামে পরিচিত হয়। দুইটী ভ্রূর মধ্যস্থলে আর একটী চক্ষু আছে; তাহাকে তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞাননেত্র বলে। ঐ একমুখী মন, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনীত হলেই 'ঈষৎজ্ঞ' হয়, পূর্ণজ্ঞ হয় না, এইজন্য ঐ স্থানকে 'আজ্ঞা' চক্র বলে। 'আ' শব্দ এখানে ঈষৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন ঐখানে যাইলেই কিছু জ্ঞানের উদয় হয়। ঐ ঈষৎ জ্ঞানযুক্ত একমুখী মনই বুদ্ধি। এইজন্য ঐ স্থানকে বুদ্ধি-তত্ত্বের স্থানও বলা হয়। ঐ অচঞ্চল বুদ্ধিরূপী মন ধীরে ধীরে অভ্যাসের ফলে সহস্রারে উঠিতে থাকে। তখনই ঐ গায়ত্রী বেদমন্ত্রে বর্ণিত সর্ব্ববরেণ্য মহাজ্যোতির কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়।

শিষ্য :—চক্ষু দুটী ত' মুদ্রিত করে রাখ্‌তে বলেছেন। কি দিয়ে সেই মহাজ্যোতির অংশ দেখা যায়?

গুরু :—ঐ যে তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞাননেত্র বলিলাম, উহার দ্বারাই দেখা যায়।

শিষ্য :—ঐ যে সহস্রার বলিলেন, ঐ বস্তুটী কি?

গুরু :—সহস্র সহস্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধির স্তরগুলি যে স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহাকে 'সহস্রার' বলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শতসহস্র নদনদী যেমন বিশাল সাগর-বক্ষে উপনীত হইয়া সমাহিত হয়, তেমনি অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্তিগুলি ঐ সহস্রারে উপনীত হইয়া সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে। ধ্যাতা ধ্যান করিতে করিতে যখন ঐ স্থানে উপস্থিত হন, তখন

প্রথমে কোটী কোটী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্থির ধীর অচঞ্চল বিবিধ বর্ণের বিদ্যুৎরশ্মি দেখিতে পান। ক্রমে সেগুলিও বর্ণ হারিয়ে ফেলে একবর্ণের হয়ে যায়, শেষে বিচারক-বুদ্ধি ঐ মহাজ্যোতিতে ডুবে যায়।

শিষ্য ঃ—তখন ধ্যাতার কি অবস্থা হয়?

গুরু ঃ—তাবায় বলে উঠা যায় না, তবু কতকটা আভাস দিতে চেষ্টা করছি, তখন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে সবই ডুবে যায়; কেবলমাত্র জেগে থাকে 'অস্মিতা'টুকু।

শিষ্য ঃ—অস্মিতা কাকে বলে গুরুদেব?

গুরু ঃ—অহম্ অস্মি—অর্থাৎ আমি আছি, এই ভাবটুকুর নাম 'অস্মিতা'। এ একটী মজার স্থান। অহং আছে, কিন্তু তার কার্য্য বা 'কার' নাই, অর্থাৎ অহঙ্কার নাই। ঐ অস্মিতাটুকু নিয়ে সেই মহাজ্যোতিতে অতল অসীম আনন্দময় অবস্থায় ধ্যাতা ডুবে থাকে। এ স্থানের কথা কি করে বোঝাব বৎস, সেখানে ব্রহ্মভাবের বুকে জীবভাব ঘুমিয়ে পড়ে। সেখানে নাম নাই, সংজ্ঞা নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, শেষে নাই ইহাও নাই। তবুও বলা হল নয় বৎস, কিছু যেন থেকে গেল। বুঝে নিও বৎস, ব্রহ্ম-গায়ত্রীর ইহাই ধীমহি। পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের সংস্কারবশে ধ্যাতা ঐ অবস্থা হইতে পূর্ব্বের নিজের অবস্থায় ফিরে আসে—ঠিক চম্পক-কুসুমসুবাসিত বসনবৎ। অর্থাৎ মনে কর—তুমি তোমার কাপড়ের মধ্যে ফুটন্ত (চাঁপা ফুলের গন্ধে সুবাসিত কাপড়ের মত; চাঁপা ফুল কিছুক্ষণ ধরে রেখেছিলে, তারপর চাঁপা ফুলগুলি তোমার অসাবধানতায় ফাঁক পেয়ে কাপড় থেকে পড়ে গেল। কাপড়ে চাঁপা ফুল নাই, তবু যেমন তার গন্ধে সেই চম্পকরাগ সংসর্গে বহুক্ষণ কাপড় আমোদিত হয়, সেইরূপ ধ্যাতা ব্রহ্মের সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে নেমে এলেও সেই সর্ব্বকর্তৃত্বময় ব্রহ্মের গুণটা ধ্যাতার মধ্যে

থেকে যায়। কাপড়খানিকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করে বহুস্থানে ব্যবহার করলেও যেমন চাঁপা ফুলের গন্ধ নষ্ট হয় না, তেমনই ঐরূপ ব্রহ্মদর্শী 'ধ্যাতা', 'ধীরহির' সাধক বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত হলেও কর্ত্তৃত্ববোধ-নাশকারী-ব্রহ্ম-সদ্‌গন্ধ থেকেই যায়। কাজেই 'যোগস্থ কুরুকর্ম্মাণি'—ইহা তাহার নিকট অসম্ভব হয়ে পড়ে না।

শিষ্য :—বৈদিকযুগে এইভাবে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বিদ্যার্থীগণ ব্রহ্মগায়ত্রীর উপাসনা করতেন। তার পর তাঁরা গৃহস্থাশ্রমে ফিরে আস্‌তেন, নয় গুরুদেব?

গুরু :—হাঁ বৎস, ঐ গায়ত্রী উপাসনার দ্বারা—আমরা কর্ত্তা নহি, আমাদের বুদ্ধি ঈশ্বর পরিচালিত করেন—এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যালাভ করেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ স্ব স্ব গৃহস্থাশ্রমে সমাবর্ত্তন করতেন এবং তাঁরাই সমাজের ও স্ব স্ব গৃহের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সর্ব্বনৈতিক উন্নতিসাধন করতেন। তাঁরা যুদ্ধ দেখ্‌লে ভয় পেতেন না, নিজের অস্থি দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধন করতেন। সে এক অমিয়ময় যুগ। যাক্ সে অন্য কথা।

তন্ত্র শাস্ত্র।

শিষ্য :—ব্রহ্মগায়ত্রীর সাধনা ব্যতীত অন্য আর কোন উপায়ে যোগস্থ হবার ব্যবস্থা আছে কি?

গুরু :—সর্ব্বসাধারণের ব্রহ্মগায়ত্রীতে অধিকার ছিল না। এইজন্যই সমাজের ছোট বড়, ইতর ভদ্র, উচ্চ নীচ, বিদ্বান্ মূর্খ, স্ত্রী, পুত্র সকলকে সযত্নে বুকে নিয়ে সাধন-পথে এগিয়ে দিতে তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব হল। ব্রহ্ম-সাধনায় প্রত্যেককে অধিকার দেওয়া হ'ল। বর্ণগত অধিকারের ব্যবস্থা উঠে গেল।

শিষ্য :—তন্ত্রশাস্ত্রকে সকলে শ্রদ্ধার চ'ক্ষে দেখে না কেন গুরুদেব ?

গুরু :—সকলে ঈশ্বরকেও ত' শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। বঙ্গের স্মার্ত্তরবি রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বে, ভারতের অদ্বৈতবাদ-প্রকাশক-রবি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত আনন্দ-লহরী-স্তোত্রে, দর্শনের ভাষ্যকার আনন্দতীর্থ প্রভৃতি তীক্ষ্ণধী মহাপুরুষগণ যে শাস্ত্রকে প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বিবিধ বিধি-ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। দুই একটী সাধারণ ব্যক্তির মন্তব্যে সে তন্ত্রশাস্ত্রের অদ্যাপি কিছুই ক্ষতি হয় নাই। মনুসংহিতায় টীকাকার কুল্লুকভট্ট তন্ত্রশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা কীর্ত্তিতা শ্রুতিঃ। ইহার অর্থ, শ্রুতি অর্থাৎ বেদ দুই প্রকার—বৈদিক বেদ, আর তান্ত্রিক বেদ।

শিষ্য :—বৈদিক বেদ কাহাকে বলা হয় গুরুদেব ?

গুরু :—বেদ অর্থে জ্ঞান বুঝিবে। ঐ জ্ঞানরূপী কল্পবৃক্ষের দুইটী কাণ্ড—একটী জ্ঞানকাণ্ড, অপরটী কর্ম্মকাণ্ড। বেদান্ত দর্শন উপনিষদ এইগুলি জ্ঞানকাণ্ড, অব্যক্ত ব্রহ্মে লীন হবার উপদেশে পূর্ণ, জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ইহাই ইহার প্রতিপাদ্য। কর্ম্মকাণ্ড, যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যা-গায়ত্রীতে পূর্ণ। ঐ জ্ঞানকাণ্ডে পৌঁছে দিতেই ইহারা সহায়তা করে। ইহাদিগকে বৈদিক বেদ কহে।

শিষ্য :—তাহলে তান্ত্রিক বেদ কাহাকে বলা হয় ?

গুরু :—শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা লইয়া মন্ত্রসাধনায় পূজা, জপ, হোম প্রভৃতির দ্বারা যমনিয়ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যৌগিকপ্রক্রিয়ার দ্বারা পঞ্চতত্ত্বাদির সহযৌগিক উপাসনার দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের যাহা উপায়স্বরূপ, তাহাই তান্ত্রিক বেদ বা তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য,—জগৎ সত্য, শ্রীগুরু সত্য, মন্ত্র সত্য, পূজা সত্য, দেবদেবী

সত্য। কোন এক স্থানে সত্য প্রতিষ্ঠা হইলেই ব্রহ্মসত্যের উপলব্ধি হয়। উহাই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। বেদের স্মর্তা যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মা, তন্ত্রের বক্তা তেমনি সদাশিব পার্ব্বতীপতি।

শিষ্য ঃ—তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ কি গুরুদেব?

গুরু ঃ—উহার বহু অর্থ আছে। আমি বলি—'তনুবিস্তারে' এই তন্ ধাতুর উত্তর, ষ্ট্রন্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ,—বিস্তৃতি বা বিস্তার বা অসঙ্কোচ। যে শাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পথ সুবিস্তৃত হয়েছে, কোথাও সঙ্কোচ নাই, গুরুমুখনিঃসৃত যে কোন মন্ত্রের দ্বারা যে কোন দেব দেবীকে প্রসন্ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়, তাহাই তন্ত্র। তন্ত্রে ব্রাহ্মণশূদ্রভেদে অধিকারের সঙ্কোচ নাই, ব্যাপক অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সুবিস্তৃত অধিকারে সকলেই অবাধে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এমন কোন ঘৃণিত পাপিষ্ঠ নাই, এমন কোন অসংযমী অধার্ম্মিক নাই, এমন কোন নীচাতিনীচ জাতি নাই, যিনি তন্ত্রের আশ্রয়ে আসিয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইবেন। ব্রহ্মবিদ্যা দানে সঙ্কোচের যবনিকা ছিন্ন করে যিনি দুইটী বাহু তুলিয়া স্নেহশীল বক্ষবিস্তারে দাঁড়িয়েছেন, সেই যোগস্থ-শিব-ভবানী-মুখনিঃসৃত বাণীই তন্ত্রশাস্ত্র।

শিষ্য ঃ—ঐ যে 'দুইটী বাহু' কাকে লক্ষ্য করছেন গুরুদেব?

গুরু ঃ—বৎস, তন্ত্রশাস্ত্রে দুইটী প্রধান সাধন-পথ উন্মুক্ত। একটী নিবৃত্তির পথে, অপরটী প্রবৃত্তির পথে। যাঁরা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন সাধক, তাঁরা নিবৃত্তিমার্গী, আর যাঁরা রাজসিক ও তামসিকভাবাপন্ন জীব, তাঁরা প্রবৃত্তিমার্গী।

শিষ্য ঃ—যাঁরা মা কালীর উপাসনা করেন, তাঁদেরই ত' কেবল তান্ত্রিক বলা হয় গুরুদেব?

গুরু ঃ—না বৎস, ইহাও তোমার ভুল ধারণা। তন্ত্রমতে যাঁরাই

উপাসনা করেন, তাঁরাই তান্ত্রিক। আর মূল বেদের মতে যাঁরা গায়ত্রী উপাসনা করেন, বেদোক্ত বিধিবোধিত মন্ত্রের দ্বারা যাঁরা যাগযজ্ঞ সংস্কার প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করেন, তাঁরা বৈদিক। তন্ত্রমতে মূল পঞ্চদেবতার সাধনা হয়ে থাকে।

শিষ্য ঃ—কি কি গুরুদেব, তাঁদের প্রকারভেদ দয়া করিয়া বলুন।

গুরু ঃ—গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি—ইহারাই মূল পঞ্চদেবতা। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও বৎস, তন্ত্রশাস্ত্রের অন্য নাম সাধন শাস্ত্র। শাস্ত্র অনেক আছে, তন্ত্রশাস্ত্রের মত আর একটী শাস্ত্র নাই—যে শাস্ত্র ধীরে ধীরে দুর্ব্বল শিশু সাধককে হাত ধরে পায়ে পায়ে দুর্গম সাধন-পথে হাঁটাতে শিখাচ্ছে, ক্রমবিকাশের পথে ব্রহ্মসন্দর্শনে জ্ঞানের বর্ত্তিকা হাতে করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ যে জগৎপিতা, জগন্মাতার স্নেহসিক্ত শাস্ত্র, প্রতি পদক্ষেপে কত মার্জ্জনা, কত দয়া, কত সান্ত্বনা, কত আশা, কত ভরসা ছড়িয়ে রেখেছেন, আমি কি করে তা প্রকাশ করব বৎস! দূরে দাঁড়িয়ে লোকে যাই বলুক, আমি বলি—এ মার্জ্জনাশীল শাস্ত্র।

শিষ্য ঃ গুরুদেব, আপনি বলুন, বড়ই কৌতূহল হচ্ছে—ঐ পঞ্চ দেবতা উপাসনার স্বরূপটী কি?

গুরু ঃ—সে বড় বিস্তৃত কথা। পঞ্চমুখ সদাশিব পঞ্চমুখে বলেও শেষ করতে পারেন নি। সংক্ষেপে বলি শোন—সর্ব্ব দেবদেবীই ব্রহ্মের প্রতীক, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাণবায়ু। তুমি যে দেব-দেবীকেই ভজনা কর না, সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হবে। যাঁরা গণেশকে অব্যক্ত ব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ মনে করিয়া গণেশ-পূজা, গণেশ-মন্ত্রজপ, উহারই ধ্যান-ধারণা, উহারই মধ্য দিয়া সমাহিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন, তাঁরা গাণপত্য উপাসক। ঐরূপ যাঁরা সূর্য্যকে অব্যক্তব্রহ্মের

পূর্ণ বিকাশ মনে করিয়া ঐরূপ সূর্য্যমন্ত্র জপ, পূজা, ধ্যানাদির দ্বারা সমাহিত হন, তাঁরা সৌর উপাসক। এইরূপ বৎস, যাঁরা বিষ্ণুর অগণিত মূর্ত্তির যে কোন মূর্ত্তিকে অব্যক্ত ব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ মনে করিয়া, সেই সেই মন্ত্র-জপ, পূজা, স্তবস্তুতি কীর্ত্তন ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা সমাহিত হন, তাঁরা বৈষ্ণব উপাসক। এইরূপ শৈব, শাক্ত সর্ব্বত্র বুঝিয়া লইবে। ইহারা সকলেই তান্ত্রিক।

শিষ্য :—গুরুদেব, বৈষ্ণবদিগকে তান্ত্রিক বলিলে, তাঁরা যে চটিয়া যান, কেন? তাঁরা কেন এরূপ আচরণ করেন?

গুরু :—আমার চেয়ে তাঁরাই ভাল জানেন—তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পার। আমি বলি,—যাঁরা উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব, তাঁরা সত্য সত্য পরম পদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন বা অদূরভবিষ্যতে লাভ করবেন, তাঁরা কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রমতকে অবজ্ঞা ত করেনই না, বরং বহুক্ষেত্রে ইহারই আশ্রয় লইয়া সাধন-পথে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীমান্ বৈষ্ণবদিগের প্রধান প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ স্বয়ং একাদশ স্কন্ধে বলিয়াছেন—"বৈদিকী তান্ত্রিকী মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধ মখঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ।" ইহার অর্থ শোন বৎস,—বৈদিক, তান্ত্রিক ও বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্র এই তিন প্রকার বিধি; যিনি যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপেই আমার উপাসনা করিবেন। আমরাও দেখ্‌তে পাই, পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বৈষ্ণব ধর্ম্মে অধিকারীর দুর্ব্বলতা চিন্তা করিয়া পরম দয়ালরূপে স্বল্পায়াসসাধ্য নূতন নূতন বিধিনিষেধ সাধন পথে দিয়ে গেছেন। কিন্তু যেখানেই সাধন ভজন, সেখানেই মূলতন্ত্রের সহিত মূলসূত্রে অনুস্যূত।

শিষ্য :—অনেক তথাকথিত বৈষ্ণবগণ দুর্গা, কালীর নাম শুনিলেই কাণে আঙ্গুল দেন, শিবঠাকুরকে পাত্তাই দেন না, গণেশ সূর্য্যের ত' কথাই নাই, এর মূল কারণ কি?

গুরু ঃ—কোন কোন মহাপ্রাণ বৈষ্ণবাচার্য্য অতি দুর্ব্বল শিশু-সাধকগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠভাব জাগিয়ে তুলতে অনেক সাধন-কষণের সৃষ্টি করেছেন। চঞ্চলমতি শিশুকে স্নেহশীল পিতামাতা যেমন অনেক সময় বেড়ার মধ্যে বা কাঠগড়ায় আটকে রেখে মানুষ ক'রে তোলেন, ঠিক সেইরূপ পরমকারুণিক বৈষ্ণবাচার্য্য অনেক চঞ্চলমতি ভক্তকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জীবকে মুক্তি দিতে পারেন, অন্য কেহ পারেন না,—এই বাণী শুনিয়ে, স্থিরচিত্তে ঐ দেবতাকেই সাধন ভজন করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন। বৎস, এ অতি উপাদেয় পন্থা। সত্যই নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে না ভাবতে পারলে, কি উপায়ে নিষ্ঠা আসিবে। কাজেই যতদিন প্রকৃত নিষ্ঠার দানা না বাঁধে, ততদিন ঐ দুর্ব্বলচিত্ত বৈষ্ণবগণ দুর্গা, কালী বা অন্য দেবতার নাম শুনিলেই, পাছে একনিষ্ঠভাব ভেঙ্গে যায়, এই ভয়ে শিউরে উঠে কাণে আঙ্গুল দিয়ে ফেলেন।

শিষ্য ঃ—ইহাতে কি অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা করা হয় না?

গুরু ঃ—প্রায় অনেক ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞার ভাবই দেখা যায়। প্রকৃত একনিষ্ঠ ভাব দেখা যায় না। অনেক তথাকথিত বৈষ্ণব মহাশয় দুর্গা, কালী প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলেন, আবার অনেক রক্তচক্ষু শাক্তগণ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ দুর্গা, কালীর চির অনুগত দাস। এ সব কেবল অজ্ঞতার লড়াই, তাও অতি নিম্নস্তরের। প্রকৃত কথা হচ্ছে,—একে বিশেষভাবে অবস্থান করাও নামই একনিষ্ঠ, তাচ্ছিল্যের অবসর কোথায়। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বা শাক্তাচার্য্যগণ ঐরূপ শিখান নাই। তাঁদের উদ্দেশ্য, শ্রীকৃষ্ণকে বা দুর্গা, কালীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ বলে মান্তে শেখান। যখন সত্যই স্ব স্ব ইষ্টদেবতার একটু জ্যোতি দর্শন হবে, তখন ঐ সব একনিষ্ঠ ভক্তের মনের অন্ধকার তিরোহিত হবে। তখন কোন দেবতার প্রতি অবজ্ঞা

ত' দূরের কথা, কোন ঘৃণিত জীবের প্রতিও অবজ্ঞা আসিবে না। তখন সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের বিকাশ দর্শন করিবে। রুচিভেদে বা অধিকারীভেদে যিনি যে দেবতারই উপাসক হউন না, ক্রমবিকাশক উন্নতির পথে নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে অখণ্ড অসীম বলিয়া একদিন আত্মহারা হয়ে পড়তেই হবে। যতদিন সে অবস্থা না আস্‌ছে, শাঁসের সন্ধান না পাওয়া যাচ্ছে, স্বভাবচঞ্চল হতভাগ্য অনেক সাধককে ঐরূপ বিদ্বেষভাবাপন্নই দেখা যায়। তন্ত্রশাস্ত্র কাউকে অবজ্ঞা করতে শিখান নাই। বরং ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল ও জাতি এই অষ্টবিধ পাশ অর্থাৎ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপদেশই পুনঃ পুনঃ দিয়াছেন। কোন আচার্য্যগণই কোথাও অবজ্ঞা করতে তাঁর দলকে শিখান নাই। কোন মহাপুরুষই সঙ্কীর্ণ হতে পারেন না। সঙ্কীর্ণতা পরিহারই মহত্ত্ব। উদ্দেশ্য—বড় হওয়া, গড়ে উঠা, তাঁর কৃপা লাভ করা, বাঁধন-কষণ আঁকড়ে থাকা বা বেড়াগুলি বজায় রাখা উদ্দেশ্য নয়। একনিষ্ঠভাব কখন সঙ্কীর্ণতার জনক নহে।

শিষ্য :—শুনেছি, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত সাধনাই প্রশস্ত, ইহা কি সত্য?

গুরু :—হাঁ বৎস, "আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" 'কলাবাগমসম্মতা' ইত্যাদি বহু প্রমাণের দ্বারা সূচিত হয়েছে—একমাত্র তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতি দ্বারাই কলিযুগে সাধন ভজন প্রশস্ত। আর হচ্ছেও তাই। যত কিছু সাধন-পদ্ধতি বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, উহাদের মূল উৎস, ঐ তন্ত্রশাস্ত্র।

শিষ্য :—একই তন্ত্রশাস্ত্র কি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, না, দেশ ভেদে তন্ত্রভেদ আছে?

গুরু :—হাঁ বৎস, দেশ ভেদে তন্ত্রভেদ আছে। বর্ত্তমান সমগ্র

এশিয়া খণ্ডই পূর্ব্বে হিন্দুস্থান বলিয়া কথিত ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে এই সমগ্র হিন্দুস্থানকে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক একটী ভাগে কতকগুলি তন্ত্রবিশেষের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ভাগের নাম, বিষ্ণুক্রান্তা প্রদেশ। ইহার সীমা নির্দ্দেশ আছে,—বিন্ধ্যাচল হইতে চট্টল প্রদেশ পর্যান্ত, অর্থাৎ বঙ্গ ও আসামের সীমারেখা পর্য্যন্ত। সিদ্ধীশ্বর, কালীতন্ত্র, কুলার্ণব, রুদ্রযামল প্রভৃতি ৬৪ খানি তন্ত্রগ্রন্থ এই প্রদেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এই বিন্ধ্যাচল হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যান্ত প্রদেশকে অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্তা প্রদেশ বলা হয়। ঐ প্রদেশে চূড়ামণি, ভূতশুদ্ধি, ভৈরণ্ডা, ধূমাবতী প্রভৃতি ৬৪ খানি তন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার বিন্ধ্যাচল হইতে নেপাল, মহাচীন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশকে রথক্রান্তা প্রদেশ বলা হয়। ঐ প্রদেশের জন্য চিন্ময়, মৎস্যসূক্ত, ইন্দ্রজাল, চীনাচার, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি তন্ত্রগুলির প্রচলন আছে।

পঞ্চমকার ও পঞ্চতত্ত্ব।

শিষ্য :—তন্ত্রে যে পঞ্চমকারের সাধনা আছে, যাহা সভ্যসমাজে অতি হেয় বলিয়া উপেক্ষিত হয়ে আস্‌ছে, উহার স্বরূপটী কি?

গুরু :—পঞ্চমকার বলিতে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পাঁচটীকেই বুঝায়। যাঁরা প্রবৃত্তিমার্গের জীব, তাঁরা ঐ পাঁচটী সাধারণভাবে ব্যবহার করেই থাকেন। ঐগুলি যথেচ্ছাচার ব্যবহার করায় জীবগণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হ'য়ে পড়তে থাকেন। মনুসংহিতায় একটী বচন আছে—'ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষাভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥' ইহার অর্থ— মাংস ভক্ষণে বা মদ্যপানে বা মৈথুনে দোষের কিছু নাই, কারণ ইহা

জীবগণের প্রবৃত্তিমূলক ব্যাপার; কিন্তু এইগুলি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহাফলদায়ক হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ঐগুলি ব্যবহার করিও না, এইরূপ সাদা কথা বলিলে কেহই শুনিবে না। কাজেই অসংযত উচ্ছৃঙ্খল জীবগণকে নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা ধীরে ধীরে সংযত ও শৃঙ্খলিত করিয়া নিবৃত্তিমার্গে টেনে আনিবার উপায়স্বরূপ,—ঐ পঞ্চমকারের ভিতর ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সাধনা, তন্ত্রের ঋষি সদাশিব অনুমোদন করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে—ঐগুলিকে তৎ তৎ মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত করিতে হয়, মন্ত্রপূত ঐ সব দ্রব্যগুলি দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়, তারপর প্রসাদরূপে উহা গ্রহণ করিতে হয়।

শিষ্য :—শুনেছি—বিনা পঞ্চমকারে তান্ত্রিক পূজা সিদ্ধ হয় না, ইহা কি সত্য কথা?

গুরু :—হাঁ বৎস, বিনা পঞ্চমকারে তন্ত্রোক্ত কোন পূজাই হয় না। যাঁরা উচ্চাঙ্গের সাধক যোগী, তাঁরা পঞ্চভূতাত্মক দেহের মধ্যেই পঞ্চমকারের সন্ধান পান, তাই দিয়া পূজা করেন। যাঁরা সাত্ত্বিক বা বৈষ্ণব, তাঁরা গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব; এই পাঁচটীর মধ্যেই পঞ্চমকারের সন্ধান পান, তাই দিয়া পূজা করেন। আর যাঁরা প্রবৃত্তিমার্গের ভোগীজীব, তাঁরাই মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা (ধান চাউল ভাজা) ও মৈথুনের দ্বারা ইষ্টপূজা করিয়া থাকেন। যিনি যাহাই ব্যবহার করিবেন, তাহাই স্ব স্ব দেবতাকে গুরুদত্ত মন্ত্রের দ্বারা পূত করিয়া নিবেদন করিবেন। ইহাতে যিনি যতই উগ্র অসংযমী হউন না, দেবতাকে ঐ সকল দ্রব্য নিবেদন করিতে গিয়া, তাঁকে ক্ষণিক ধৈর্য্য ও সংযমের আবহাওয়ায় পড়তেই হয়, অসংযমের খরস্রোতে একটু বাধা পড়ে। জমার ঘরে কাণাকড়িও পুঁজি হচ্ছিল না, তবু ঐ লোভাক্রান্ত জীবকে ঐ সকল লোভনীয় দ্রব্য ব্যবহার করতে গিয়ে গুরুদত্ত মন্ত্রও স্মরণ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। পুনঃ পুনঃ

এইরূপ অভ্যাসের ফলে দেবতায় বিশ্বাস ও ধীরে ধীরে একটু ভক্তি-ভাবও উপচিত হতে থাকে। ফলে ঐ উপচিত ভক্তিভাবই সুদূর ভবিষ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায় হয়।

শিষ্য :—ঐ যে শেষ তত্ত্ব মৈথুন—যোগীরা দেহের মধ্যে কিভাবে সন্ধান পান ?

গুরু :—জীবভাবের সঙ্গে ব্রহ্মভাবের যে মিলন—ইহাই শ্রেষ্ঠ মৈথুন। সাত্ত্বিক বৈষ্ণবের পক্ষে ধ্যান-তত্ত্বই শেষ তত্ত্ব, অর্থাৎ মৈথুন। ধ্যান করতে হলেই বধূরূপী ধ্যাতা, পুরুষরূপী দেবতাকে চিন্তার দ্বারা মিলিত হইয়া থাকেন। ভোগীরা পঞ্চমকার সাধনায় মৈথুন তত্ত্বের জন্য পূর্ব্বে পরকীয়া স্ত্রী আনয়ন করিতেন, দেবীভাবে তাঁকে পূজা করিতেন, তাঁর সর্ব্বশরীরে এক হাজার আটবার জপও করিতেন, পরে মন্ত্রজপে রত থাকিয়া মৈথুনে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু কলিযুগে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—"শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্য্যং প্রবলে কলৌ। স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা"। ইহার অর্থ—হে মহেশানি, মানবগণ প্রবল কলিকালে অল্পবীর্য্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং ঐ শেষ তত্ত্ব নিজ পবিত্র ধর্ম্ম পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে। আরও মহানির্ব্বান তন্ত্রে লিখিত আছে—বিনা পরিনীতাং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্। পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়। ইহার অর্থ—বিবাহিত পত্নী ব্যতীত সাধক অন্য কোন শক্তি গ্রহণ করিলে, তাহা পরস্ত্রীগমনের তুল্য পাপই হইবে। তবে যদি কেহ তন্ত্রের দোহাই দিয়া মদ্যপান করিয়া, পরকীয়া রমনীসঙ্গে ব্যাভিচার ইত্যাদি করেন, তিনি একদিন নিজের ভুল নিজেই ধরে ফেল্‌বেন। তাঁর জন্য তোমরা ঐরূপ ব্যক্তিকে কিছু না বলিয়া দূরে থাকিও।

শিষ্য :—সত্যই কি গুরুদেব, আমাদের স্ব স্ব ইষ্টদেবতা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মদ্য মাংস খাইতে ভাল বাসেন?

গুরু :—বেশ উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ। তোমার যিনি ইষ্ট দেবতা, তিনিই ত সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম ব্যক্ত হয়েছেন। তিনি ত ছোট খাটো কেউ নন্। তিনি অসীম, তিনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর, তিনি সৃষ্টি স্থিতিলয় রূপে প্রকাশক, তিনি সত্বরজ তমোগুণে সর্ব্বত্র অন্বিত তিনি বিশ্বের জনক পালক আবার সংহারক। তিনি পিতা, আবার তিনিই মাতা। কাজেই তিনি কাহার অধীন নন্, কোন বিষয়ে, কোন ব্যাপারে, কোন ভাবে কোন অভাবে কোন দ্রব্যে তাঁহার অপ্রীতি নাই তিনি সর্ব্বত্রই প্রীত, সর্ব্বদাই তিনি পূর্ণ। এমন যে তোমার ইষ্টদেবতা, ইহা হইতে তুমি নিজেকে পৃথক মনে কর, তাঁর অখণ্ড কর্ত্তৃত্ব মেনে নিতে পার না। কাজেই তুমি যে রূপ বোধের দ্বারা তাঁকে গ্রহণ করবে, তিনি সেইরূপ বোধান্বিত হয়েই তোমার নিকট প্রতিভাত হবেন। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কিছুই করেন না, তোমার ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি আবার সবই করেন। ওগো, তাঁর মত দয়াল কে আছে, তাঁকে যা দিয়ে তোমার তৃপ্তি হয়, তিনি তাই গ্রহণ করেন। পত্র পুষ্প ফল জল মদ্য মাংস যা ভক্তিভাবে দিবে তিনি তাই লইবেন।

শিষ্য :—তাঁকে যদি না দিয়া আমি কিছু ভোগ করি, তিনি রুষ্ট বা অতৃপ্ত হবেন ত?

গুরু :—নিশ্চয়ই হবেন। তোমার জিনিষ তোমার অনুমতি না লইয়া, বা তোমাকে নিবেদন না করিয়া যদি কেহ তাহা গ্রহণ করে, তুমি যত দিন ঐ রূপ ব্যবহারে রুষ্ট বা অতৃপ্ত হইবে, তোমার ও ইষ্ট দেবতা তোমার নিকট হইতে অনুরূপ ব্যবহার পাইলে ঠিক ততদিন তিনিও রুষ্ট বা অতৃপ্ত হইবেন। তুম্ ব্যায়সা, হাম ভ্যায়সা, তুম্

ডাহিনে যাও ত, ডাহিনে যায়, বামে যাও ত বাম। এই মহাপুরুষের বাণী ভুলিওনা।

শিষ্য :— গুরুদেব, আপনার কৃপায় বেশ বুঝলাম। এখন বলুন ঐ পঞ্চ মকারকে পঞ্চ তত্ত্ব বলা হয় কেন? উহাকে কুলাচার আখ্যা দেওয়া হয় কেন?

গুরু :— তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা পূজা করবার ব্যবস্থা আছে। তত্ত্ব শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলেছি। পুনরায় স্মরণ করিয়া লও। তাঁহার ভাব যাহা তাহাই 'তত্ত্ব'। তাঁকে পেতে হলেই তাঁর ভাবের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হ'তে হবে। তাঁর অনন্ত কোটী ভাবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ওত-প্রোত ভাবে বিজড়িত। এই অনন্তকোটীর ভাবের মধ্য দিয়া তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা বাস্তব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সাধকের পক্ষে সম্ভব নাহ। তাই মূল পঞ্চ ভূতের মধ্য দিয়া তাঁর সত্ত্বা উপলব্ধি করিবার সাধনা তন্ত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শিষ্য : – ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতকেই পূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি প্রধান তত্ত্বের মধ্যে ফেলিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তা হলে পঞ্চভূত আর পঞ্চ তত্ত্ব ইহাদের লক্ষ্য কি একই?

গুরু :— হাঁ বৎস, ভূ ধাতু ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া 'ভূত' শব্দ প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং 'ভূত' শব্দের অর্থ 'ভাব' আর তত্ত্ব শব্দের অর্থ তাঁহার 'ভাব'। এখন ঐ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পাঁচটী ভাবকে লইয়া তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত করিলেই পঞ্চ তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাঁর 'ভাব' অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা যে বিকল্পশূন্য-আচরণ, তাহাই 'কুলাচার' নামে খ্যাত। সুতরাং পঞ্চ ভূতে ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা যিনি বিকল্প পরিশূন্য তিনিই 'তত্ত্বজ্ঞ' বা 'কৌল'।

শিষ্য :— ঐ যে ব্রহ্ম বুদ্ধির দ্বারা বিকল্প পরিশূন্য হ'তে বলিলেন, উহার স্বরূপ কি?

গুরু :—আকাশে বাতাসে জলে স্থলে অনলে সর্ব্বত্রই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিরাজ করছেন, প্রত্যেক বস্তুটাই সেই অনন্তবীর্য্য ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নয়,—এই একান্ত বোধ সত্য সত্য ফুটিয়ে তোলার নামই বিকল্প-পরিশূন্য ব্রহ্মবুদ্ধি। এই ব্রহ্মবুদ্ধি, সাধক হৃদয়ে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হতে থাকে। ঊষার আলোক-ছটায় দীর্ঘ নিশার গাঢ় অন্ধকার যেমন ধীরে ধীরে পাতলা হতে থাকে, ঠিক সেইরূপ বহু অনুশীলিত ঐ ব্রহ্মবুদ্ধির উদয় হলে, সাধকের জন্মজন্মান্তরের দ্বৈতবুদ্ধি জাত অন্ধ সংস্কারও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। সে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। এই সময়েই সাধকগণ যথার্থই পূর্ণাভিষিক্ত হন। অপরিণত অবস্থায় পদ্ধতি লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই পঞ্চ পল্লবের জল মস্তকে সিঞ্চন করিলেই প্রকৃত পূর্ণাভিষেকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

শিষ্য :—গুরুদেব, পূর্ণাভিষেক তা হলে সাধকের শেষ কৃত্য।

গুরু :—হাঁ, বৎস, বৈদিকমতে যেমন দশবিধ সংস্কার গৃহস্থের আছে। তন্ত্রমতে দীক্ষাদিগ্রহণ হইতে পূর্ণাভিষেক পর্য্যন্ত সাধনপথে অনেকগুলি সংস্কার আছে। পূর্ণাভিষের পর সাধক কৌল বা অবধূত হন। উহাই তন্ত্রমতে সন্ন্যাস। উহাই গৃহীর এক কর্ত্তব্য বোধ।

শিষ্য :—তন্ত্রে শাক্তাভিষেক সংস্কারটী তা হলে কোন্ অবস্থায় সাধকের পক্ষে করণীয়?

গুরু :—দীক্ষা গ্রহণের পর, গুরুদত্ত মন্ত্র জপ আরম্ভ হলেই শাক্তাভিষেক অবশ্য করণীয়। শাক্তাভিষেকের প্রভাবেই ইষ্টমন্ত্রে চৈতন্য শক্তির সঞ্চার হয়। সাধকের অভিষ্টসিদ্ধির পথ সুগম হয়।

শিষ্য :—কতদিন গুরু দত্ত মন্ত্র জপের পর শাক্তাভিষেকের অধিকার আছে।

গুরু :—অধিকারীভেদে বিষয়টী বিবেচ্য। তবে আমার মনে হয় যে কোন প্রকারে এক কোটী জপের সমাপ্তির পর শাক্তাভিষেক বিশেষ ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

শিষ্য :—যাক্, এখন অপনি দয়া করে বলুন—কি ভাবে, পঞ্চভূতকে ব্রহ্মভাবে অনুপ্রাণিত করতে হয়।

ইতি প্রথম-স্তবক-শেষ।

গুরুঃ—পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর বৎস, অব্যক্ত ব্রহ্ম বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁর ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত ঐ পঞ্চভূতের ভিতর দিয়া গুণভেদে রূপভেদের সৃষ্টি করিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতে এমন কোন সত্তা পাবে না—যাহা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চভূতকে বাদ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখ,—ক্ষিতি, অর্থাৎ মাটি হইতে যাবতীয় গন্ধের উৎপত্তি, নাসিকার দ্বারা ঐ গন্ধ আমরা গ্রহণ করি। সদ্গন্ধ হউক, দুর্গন্ধই হউক, যেখানে যত গন্ধ-দ্রব্যই থাকুক, সবই তাঁর ভাবে ভাবিত। এই তত্ত্বের নাম ক্ষিতি-তত্ত্ব। ১। অপ্ শব্দে জল বুঝায়, ঐ জল হইতে যাবতীয় রসের উৎপত্তি, জিহ্বার দ্বারা আমরা ঐ রস গ্রহণ করি। এ বিশ্বে যেখানে যত রস যেভাবেই থাকুক, সবই তাঁর ভাবে ভাবিত, এই তত্ত্বের নাম জল-তত্ত্ব। ২। তেজ হইতে যাবতীয় রূপের উৎপত্তি। একটী বৃক্ষ বা একটী মানুষ বা জন্তু যতটুকু নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ততটুকু রূপহীন হয়। তেজই রূপের জনক, চক্ষুর দ্বারা আমরা ঐ রূপ গ্রহণ করি। যেখানে যত রূপের সমাবেশ হউক না, যেখানে যতই তেজস্কর বস্তু থাকুক না, সবই তাঁর ঐ তেজভাবে ভাবিত—এই তত্ত্বের নাম তেজস্তত্ত্ব। ৩। মরুৎ শব্দের অর্থ—বায়ু, সমীরণ, সঞ্চালন ইত্যাদি। ইহার দ্বারা স্পর্শের উৎপত্তি হয়। ত্বকের দ্বারা আমরা ঐ স্পর্শ গ্রহণ করি। যেখানে যেভাবেই কোমলতা, কাঠিন্য, শীতলতা বা উষ্ণতা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আদান-প্রদান থাকুক না, সবই তাঁর ঐ বায়ুভাবে ভাবিত। ৪। তারপর বৎস, ব্যোম শব্দের ব্যাখ্যা শোন—ব্যোম শব্দের অর্থ—আকাশ, শূন্য; উহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়। কর্ণের দ্বারা আমরা ঐ শব্দ গ্রহণ করি। যেখানে যে শব্দ উত্থিত হউক,—একটী সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বা একটী বাক্যের ঝঙ্কার বা একটী বর্ণের অথবা একটী মাত্রার উৎপত্তি—সব তাঁর ঐ আকাশ-ভাবে ভাবিত। এই তত্ত্বের নাম আকাশ-তত্ত্ব।

শিষ্য :—গুরুদেব, আপনার কৃপায় পঞ্চভূত হইতে পঞ্চ-তত্ত্বের সন্ধান পাইলাম। ক্ষিতি-তত্ত্ব, জল-তত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ু-তত্ত্ব ও আকাশ-তত্ত্ব। কিন্তু এইগুলি দিয়া কিরূপে ইষ্টপূজা হওয়া সম্ভব, বা পঞ্চ মকারের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ?

গুরু :—বৎস, পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ তুমি এখনও ঠিক গ্রহণ করিতে পার নাই। প্রথমে আর একটী কথা বুঝিয়া লও,—ঐ যে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত, উহাদের পরস্পরের সংমিশ্রণেই জগতের সমুদয় বস্তু প্রস্তুত হয়েছে। এমন একটী বস্তু দেখাতে পারবে না, যাহাতে নিছক একটী তত্ত্বই নিহিত আছে।

শিষ্য :—কেন গুরুদেব, ধরুন একটী ফুল, উহাতে কি আকাশ-তত্ত্ব আছে ?

গুরু :—হাঁ বৎস, ঐ ফুলে ক্ষিতি-তত্ত্ব, জল-তত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ু-তত্ত্ব ও আকাশ-তত্ত্ব সবই আছে। কোন্ তত্ত্বেরই উহাতে অভাব নাই, তবে ক্ষিতি-তত্ত্ব গন্ধরূপে ঐ ফুলে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, এইজন্য উহাকে ক্ষিতি-তত্ত্বের প্রতীক ধরা হয়। ফুলের মধ্যে যে ফাঁক বা আকাশ আছে, উহাই আকাশ-তত্ত্ব। উহাতে যে কোমলতা আছে, উহাই বায়ু-তত্ত্ব। পঞ্চভূতের পঞ্চীকৃত অবস্থাই দৃশ্যমান জগৎ।

শিষ্য :—ফুলের পরিসরের মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে, উহা ত ফুল নয়। ধরুন—একটী পাঁপড়ি, উহাতে আকাশ কোথায় ?

গুরু :—আরও একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা কর বৎস, ঐ যে ফুলের পাঁপড়ি বা পাতা, উহাতে যে ক্ষিতি আছে, ঐ ক্ষিতি প্রতীয়মান হ'চ্ছে কতকগুলি অণু সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে। ঐ ফুলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে অসংখ্য অণু র'য়েছে, ঐ অণুগুলির পরস্পর ব্যবধানের মধ্যেও কিছু ফাঁক র'য়ে গেছে।

স্থূল দৃষ্টিতে ফাঁক না দেখা গেলেও, অণুগুলির পৃথক পৃথক সত্ত্বা ফাঁকের ভিতর দিয়ে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

শিষ্য :—আচ্ছা ধরুন—খাঁটি সোনা, সম্পূর্ণ খাদ বাদ দেওয়া হ'য়েছে। উহাতে আর কিছুমাত্র আকাশ না থাকায়, কোনরূপ আওয়াজ হচ্ছে না—কেবল ঢপ ঢপ করছে। এখানে খাঁটি সোনায় আকাশ-তত্ত্ব কোথায় পাচ্ছেন?

গুরু :—বৎস, বেশ কথা বলেছ। খাঁটি সোনার আওয়াজ হয় না বল্লে—ঢপ্ ঢপ্ করছে। ঐ ঢপ্ ঢপ্ করাটা, উহা শব্দ কিনা? কাজেই ওখানেও আকাশ আছে।

শিষ্য :—হাঁ গুরুদেব, উহা আমি লক্ষ্য করি নাই।

গুরু :—তাহা হইলে উহা বুঝিয়া লও—যেখানে ক্ষিতি, সেখানে আকাশ আছেই। অণুগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, রসের সাহায্যে। ঐ খাঁটি সোনার মধ্যেও রস আছে, তার তেজ আছে, তার কাঠিন্য আছে। ঐখানে তেজের প্রাধান্য আছে, তাই তেজস্তত্ত্বের প্রতীক ধরা হয়। পঞ্চতত্ত্বের সংমিশ্রণেই জগতের সত্ত্বা। যেখানে যে তত্ত্বটী প্রধানভাবে আছে, সেইটীকে সেই তত্ত্বের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়। পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য লইয়া একসঙ্গে ব্রহ্মসত্ত্বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই তন্ত্রের ঋষি পঞ্চতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন এবং পঞ্চমকার মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পাঁচটীকে পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক বলিয়া নির্দ্দেশ দানও করিয়াছেন।

শিষ্য :—কোন্‌টীকে কি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে গুরুদেব?

গুরু :—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সপ্তমোল্লাসে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—আদ্যং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে। অপস্তৃতীয়ং জানীহি, চতুর্থং পৃথিবীং শিবে। পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে। ইত্থং জ্ঞাত্বা কুলেশানি কুলং তত্ত্বানি পঞ্চ চ। আচারং কুলধর্ম্মস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ইহার

অর্থ,—হে প্রিয়ে, আদ্য অর্থাৎ মদ্যকে তেজ বলিয়া জানিবে। দ্বিতীয় মাংসকে পবন, তৃতীয় মৎস্যকে জল, চতুর্থ মুদ্রাকে পৃথিবী, পঞ্চম মৈথুনকে জগদাধার নভোমণ্ডল বলিয়া জানিও। হে মহেশানি, মনুষ্য এই প্রকারে কুল, পঞ্চতত্ত্ব এবং কুলধর্ম্মের আচার জানিয়া সাধন-ভজন করিলে জীবন্মুক্ত হতে পারে। এইবার শোন বৎস, কিভাবে ঐগুলিকে প্রয়োগ করা হয়। ধরিয়া লও, মদ্যাদির দ্বারা পঞ্চতত্ত্বে মা কালীকে উপাসনা করিতেছ। পাত্রস্থ মদ্য মন্ত্রপূত করিয়া দেবীকে নিবেদন করিলে। মদ্যকে 'তেজ'রূপে জ্ঞান করিতে হইবে, মদ্যে মদ্যবুদ্ধি রাখিলে চলিবে না, কারণ সদাশিব বলিয়াছেন—আদ্যং বিদ্ধি তেজো। 'বিদ্ধি' এখানে জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু প্রয়োগ করায় ইহাই সূচিত হচ্ছে যে, উহাই তেজ এই বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ বস্তুতে ঐ জ্ঞান না হইলে তত্ত্বপূজা হইবে না।

শিষ্য :—মদ্যকে কিভাবে তেজরূপে জ্ঞান করিতে হইবে, গুরুদেব ?

গুরু :—মদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনুভব করিতে হইবে। **'এতত্তেজো জগতাং তেজঃ,' 'জগতাং তেজ স্তুদীয়ং তেজঃ', ত্বদীয়ং তেজঃ এতত্তেজঃ'**। ইহার অর্থ,—এই মদ্যনিহিত যে তেজ, ইহা জগৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, জগতের যে তেজ হে মা কালী, তোমা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং এই মদ্যনিহিত যে তেজ, ইহা তোমারই তেজ, তুমি ইহার কারণ, আমি এই কারণরূপী তেজ গ্রহণ করিতেছি। এইরূপ মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন প্রত্যেক বস্তুটীতে বিকল্প-পরিশূন্য ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিতে অভ্যাস করিতে হয়। তন্ত্রে এইগুলিকে অতি গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। এইরূপ করিতে না পারিলে, কেবল মদ্যাদি পান করাই হয়, প্রকৃত কাজ হয় না। কাজেই পঞ্চ মকারের নাম শুনিলেই লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরায়।

শিষ্য :—সত্যই গুরুদেব, পঞ্চ মকার-সাধনায় অসংযমের স্থান নেই। কিন্তু এখন আমার জিজ্ঞাস্য, পঞ্চতত্ত্বের সাধনাই তন্ত্রে বৈজ্ঞানিক ব্রহ্ম-সাধনা। পঞ্চ-মকারকে বাদ দিয়া কিরূপে পঞ্চতত্ত্বের সাধনা সম্ভব হয়, যাঁরা মদ্য মাংস স্পর্শ করেন না, তাঁরা কিভাবে পঞ্চতত্ত্বের সাধনা করিবেন ?

গুরু :— উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ বৎস। পঞ্চ-মকারই পঞ্চতত্ত্বের কেবল একমাত্র প্রতীক নহে। সদাশিব পঞ্চানন, পঞ্চবক্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের অগণিত প্রতীকের উল্লেখ করেছেন। কতকগুলির নাম শুনিয়া রাখ, যথা—পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চ-পল্লব, পঞ্চবর্ণগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চকষায়, পঞ্চবটী, পঞ্চমুদ্রা, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চঘট ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটীকেই পঞ্চভূতের প্রতীক পঞ্চতত্ত্বরূপে গ্রহণ করা যায়। মনে কর—পঞ্চামৃতরূপ পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা পূজা করিবে। পঞ্চামৃত বলিতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা বুঝায়। দধিকে ধরিয়া লও ক্ষিতিতত্ত্ব, এইরূপ দুগ্ধ জলতত্ত্ব, ঘৃত তেজস্তত্ত্ব, মধু বায়ুতত্ত্ব এবং শর্করা আকাশ-তত্ত্ব। প্রত্যেক বস্তুতে প্রত্যেক তত্ত্বের দ্বারা নির্বিকল্প ব্রহ্মবুদ্ধিতে ব্রহ্মসত্বাকে অনুভব করিতে হয়। ইহাই ত তন্ত্রোক্ত তত্ত্বপূজা। এইরূপ যেখানে যে পাঁচটীর মধ্যে তাঁর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবে, সেইখানেই তাঁর পঞ্চতত্ত্ব ফুটে উঠিবে। পরমহংসদেবও মাটি টাকা, টাকা মাটি, এইভাবে পঞ্চতত্ত্বের সাধনা করেছিলেন।

শিষ্য :— গুরুদেব, পঞ্চতত্ত্বের পূজা বড়ই প্রাণস্পর্শী। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র বিরাজ করছেন, এই ব্রহ্মবোধ ফুটিয়ে তোলবার এক অনবদ্য পদ্ধতি, তন্ত্রকার আবিষ্কার করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পঞ্চতত্ত্বের পূজা আমরা আর দেখতে পাই না, মনে হয়, উহা দেশ থেকে উঠে গেছে।

গুরু :—না বৎস, যাহা সত্য, তাহা বিলুপ্ত হয় না। তন্ত্রের নামে লোকে বীতশ্রদ্ধ, তাই চক্ষের সম্মুখে তন্ত্রোক্ত পঞ্চতত্ত্বের পূজা চলেছে,

দেখেও দেখেনা। ঐ দেখ, তোমাদের পুরোহিত মহাশয়, একটী পূজার জন্য ঘটস্থাপনা করেছেন। সংগৃহীত মাটীর উপর পঞ্চশস্য দিয়াছেন, তাহার উপর জলপূর্ণ ঘট বসাইয়াছেন, আবার ঘটটী সিন্দুররাগরঞ্জিত করেছেন, ঘটের উপরে পঞ্চপল্লব দিয়াছেন, তাহার উপর একটী সশিষ নারিকেল বসাইয়াছেন। এইবার ঐ ঘটের উপর একটী আচ্ছাদন দিয়া ঈশ্বরের আহ্বান করিতেছেন। ঐ যে মাটি, উহাই ক্ষিতিতত্ত্ব, অনুধ্যান করিবার প্রতীক, এইরূপ ঐ যে ঘটস্থ পবিত্র বারি, উহাই জলতত্ত্ব, ঐ যে সিন্দুররাগ উহাই তেজস্তত্ত্ব, ঐ যে পল্লবস্তবক, উহাই বায়ুতত্ত্ব, ঐ যে নারিকেল, উহাই আকাশতত্ত্ব। সন্দেহপরিশূন্যব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা ঐ পঞ্চভূতের প্রতীক-রূপঘটস্থাপনায় ব্রহ্মবোধ বা উপাস্য দেবতার সান্নিধ্য চিন্তাই পঞ্চতত্ত্বের উপাসনা।

শিষ্য :—গুরুদেব, পূজাকালে শত শত বার ঘট স্থাপনা দেখেছি—কিন্তু তন্ত্রের ঐ গূঢ়রহস্যের কথা এক দিনও ভাবি নাই।

গুরু :—আরও দেখ বৎস,—তোমরা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দেবদেবীর আরত্রিক উপাসনা, অর্থাৎ আরতি দেখ্‌ছ। উহাও তন্ত্রোক্ত পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা। বুঝিয়া লও—পঞ্চ প্রদীপস্থ দীপগুলিই তেজস্তত্ত্ব, শঙ্খস্থ পূতবারি জলতত্ত্ব, সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী, চামর বা পাখা, উহাই বায়ুতত্ত্ব, ঐ যে গন্ধাধার পুষ্প, উহাই ক্ষিতিতত্ত্ব, ঐ যে দোদুল্যমান ঘণ্টা, অবিরত বাজিতেছে, উহাই আকাশতত্ত্ব। এইগুলির দ্বারা যে ত্রিসন্ধ্যা দেব-উপাসনা, যদি অনুভূতির সহিত ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলেই পঞ্চতত্ত্বের উপাসনা সিদ্ধ হইল। এইভাবে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে ভক্ত সাধক দেখিতে পান, বিশ্বপ্রকৃতি সর্ব্বদাই তাঁর আরত্রিক উপাসনায় নিরতা। ঐ দেখ,—অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে তেজস্তত্ত্ব, শস্যশ্যামলা বিবিধগন্ধোৎপাদিনী ধরণীকে

ক্ষিতিতত্ব, কল্লোলিত সপ্ত সমুদ্রকে জলতত্ব, সদাবহ বিশ্বব্যাপী উনপঞ্চাশৎ পবনকে বায়ুতত্ব, বেদগানমুখরিত মহাব্যোমকে আকাশ-তত্বরূপে গ্রহণ করিয়া মহাযোগিনী মা আমার, যোগেশ্বরের মহাপূজায় নিমগ্না। বৎস, ঐ মহাশক্তি মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও।

অষ্টাঙ্গ যোগ।

শিষ্য :—আপনি ইতিপূর্ব্বে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, দয়া করিয়া উহার ভেদটী বুঝাইয়া দিন।

গুরু :—ব্রহ্ম-সাধনা করতে হলেই গুরুমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করতেই হয়। মত ও পথ অসংখ্য; স্বেচ্ছাচারী হইয়া ছুটাছুটি করিলে কোনদিনই লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। শৈবাগম নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্রশাস্ত্রমনীষিভিঃ। স্বগুরোর্মত-মাশ্রিত্য শুভং কার্য্যং ন চান্যথা॥ ইহার অর্থ,—বহু মুনি-ঋষি, বিবিধ শাস্ত্র, মন্ত্র ও পথের কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিজ গুরুদেবের আদিষ্ট সাধনকার্য্যের দ্বারাই অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে, অন্যপ্রকারে হতে পারে না। সাধারণতঃ একমাত্র শ্রীগুরুদেবপ্রদত্ত মন্ত্রজপের দ্বারাই ব্রহ্মসাধনা সিদ্ধ হয়। সাধন সোপান, প্রথম ভাগে ১৩০ পৃষ্ঠায় জপের প্রাথমিক প্রণালী ব্যাখ্যাত হয়েছে।

শিষ্য :—কেবল মাত্র মন্ত্রজপের দ্বারাই কি যোগস্থ হওয়া যায়?

গুরু :—নিশ্চয়ই। 'জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ'—এই শিববাক্য কদাচ মিথ্যা নহে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, ও সমাধি,—এই আটটী যোগস্থ হবার বা ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের দ্বারস্বরূপ। সাধকের লক্ষ্য, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। সাধক অব্যক্ত ব্রহ্ম-শক্তির সহিত যুক্ত হতে পারলেই সিদ্ধ হলেন, যোগস্থ হলেন,

বিভূতিমান হলেন। কেহ আসন সিদ্ধি কেহ বা প্রাণায়াম সিদ্ধিরূপ এক একটী দ্বারে সিদ্ধিলাভ করেন, উহাতেই সাধকের চরম উদ্দেশ্য সফল হয় না। সাধক ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই সমাধিরূপ অষ্টম দ্বারে উপনীত হন। প্রথম দ্বার সংযম হইতে সপ্তম দ্বার ধারণা পর্য্যন্ত দ্বারগুলি প্রায় একসঙ্গেই সাধকের নিকট ন্যূনাধিক উন্মুক্ত হতে থাকে একমাত্র গুরুদত্ত মন্ত্রজপের দ্বারা। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে ক্রমে সমাধিও এসে দেখা দেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভেচ্ছু সাধক কোন একটী বিশেষ দ্বার লইয়া অনুশীলন করেন না।

শিষ্য :—কিভাবে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাস করতে হয় গুরুদেব ?

গুরু :—বেশ কথা, প্রথমেই যম শব্দে কি অর্থ পাওয়া যায় দেখ— যম্ ধাতুর অর্থ, উপরম, কোন একটী বিষয়ে একনিষ্ঠা। একনিষ্ঠ হতে হলেই, অন্য কার্য্য হইতে সংযত হতে হয়। সাধক যখন জপে বসিলেন জপই করিব, এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া যাবতীয় বিষয়ান্তর হইতে স্বাধীন হইলেন। জপ বিষয়ে ইহাই সংযম বা যম প্রথমদ্বার। দ্বিতীয় দ্বার,—নিয়ম। শ্রীগুরুদেবের উপদেশগুলি মানিয়া জপ করিতে হয়, মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে হয়, কেমনভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, এইগুলি মানিয়া চলাই 'নিয়ম'—ইহাই দ্বিতীয়দ্বার। জপ করিতে হইলে কেমনভাবে বসিতে হয়, মেরুদণ্ড কেমনভাবে রাখিতে হয়, দেহের গঠন হিসাবে কিভাবে বসিলে স্বস্তি বোধ হয়, ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীগুলি কিভাবে কার্য্যকরী হয়, এইসব ভালভাবে জানিয়া অচঞ্চল উপবেশন, তাহাকেই 'আসন' কহে—ইহাই তৃতীয়দ্বার। সাধক এইবার মন্ত্রজপ করিতে করিতে ইষ্টদেব মূর্ত্তিতে লক্ষ্য স্থির করিলেন। নিবিষ্টচিত্তে যে কোন বিষয় দেখিতে গেলেই শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ুর গতি স্থির হইতে স্থিরতর হইতে থাকে, উহার ফলে প্রাণ-বায়ু

স্থির হয়, আয়াস বা আরাম লাভ করে। এই যে প্রাণের আরাম ইহাই প্রকৃত প্রাণায়াম যোগসাধনার চতুর্থ দ্বার। একান্ত ভক্তিভাবে একাগ্রমনে মন্ত্রজপ করিতে করিতে সাধক এই প্রানায়ামের সন্ধান পাইয়া থাকেন।

শিষ্য :—অনেকে যে নাক টিপে প্রানায়াম অভ্যাস করেন, সেটা কি?

গুরু :—তাহার উদ্দেশ্য ঐ প্রাণবায়ু স্থির করা। কিন্তু বৎস, তাহাতে খুব বিপদ আছে পূরক, কুম্ভক, রেচক, এ তিনটী প্রক্রিয়া অভ্যাস করিতে গিয়া অনেক সাধককে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'তে হয়েছে। উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ঐরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ু রুদ্ধ করতে যাওয়া, দুঃসাহসিক কার্য্য। অবশ্য ঠিক ঠিক অনুশীলন করতে পারলে, উহাতে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। সেও একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে উহাতে বিপদও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রাণায়াম কৌশল মাত্র শিক্ষাই সাধকের লক্ষ্য নহে সাধক স্থির লক্ষ্যে ছুটেছেন, তাঁর গুরুদত্ত মন্ত্র মননের দ্বারা ব্রহ্ম সংদর্শনে ব্রহ্মবিদ্যালাভের আশায়, প্রকৃত যোগস্থ হবার প্রাণভরা ব্যাকুলতা নিয়ে। তিনি ছোটেননি, হঠযোগের দ্বারা আপাত বিস্ময়কর ক্ষুদ্র শক্তিলাভের জন্য। প্রানায়াম যোগের একটী অঙ্গ, উহাই প্রধান যোগ নহে। মন যতটা স্থির হবে, প্রানায়াম ততটা পরিপুষ্ট হবে। একান্ত অনুরাগের সহিত অদম্য অভ্যাসই মনস্থিরের প্রকৃষ্ট প্রস্থা। শ্রীমান অর্জ্জুনের মনস্থির বিষয়ের প্রশ্নে ঐ কথাই বলে গিয়েছেন। "অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বিরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"। অভ্যাস করিয়া দেখিও বৎস, ইহা আদৌ মিথ্যা নহে; "জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ" ইহাও ভাবিয়া দেখিও।

শিষ্য :—এইবার পঞ্চমদ্বার প্রত্যাহারের কথা বলুন গুরুদেব।

গুরু :—প্রত্যাহার শব্দের মূলঅর্থ আগে জানিয়া লও। প্রতিযুক্ত আহার শব্দের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, প্রত্যাহার শব্দ। প্রতি বস্তু হইতে মনটাকে আহরণ করা অর্থাৎ টেনে নিয়ে আসার নাম প্রত্যাহার। মনের স্বভাব, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করা। গুরুদত্ত মন্ত্রজপ করিতে করিতে ইষ্ট মূর্ত্তিতে মনটাকে গুটিয়ে নিয়ে এসে তোলার যে প্রণালী, তাহা পঞ্চমদ্বার, প্রত্যাহার নামে কথিত। প্রত্যাহার স্থায়ী হইলেই ধ্যান, ধ্যান স্থায়ী হইলেই ধারণা, আবার ধারণা স্থায়ী হইলেই সমাধি।

শিষ্য :—ধ্যান ধারণা ও সমাধির বিষয়ে একটু বিস্তৃতভাবে বলুন। এত সংক্ষেপে বলিলে অনুসরণ করিতে পারিব না।

গুরু :—বৎস, যুগযুগান্তর ধরে আমি যদি ঐ ধ্যান ধারণা সমাধির সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করি, তবু আমার বলার শেষ হবে না। আর তুমি যদি শত শত বর্ষ ঐ বিষয় শোন, তোমারও শুনে পূর্ণ তৃপ্তি হবে না। ইহা বলা বা শোনার বিষয় নয়। ইহার সত্য উপলব্ধি করতে হলে, গুরূপদেশে বিশ্বাসী হয়ে অভ্যাস করতে হয়।

শিষ্য :—কিভাবে অভ্যাস করতে হয়, দয়া করে বলুন গুরুদেব।

গুরু :—প্রত্যাহার অভ্যস্ত হলেই ইষ্টদেবতাকে মনে পড়ে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেক জীবেরই একটী করিয়া অন্তশ্চক্ষু বা তৃতীয় চক্ষু থাকে একথা পুর্ব্বেই বলেছি, প্রত্যহ সেই চক্ষুর দ্বারা দেখিবার চেষ্টা করিলে, অভ্যাসের ফলে উহা উন্মিলিত হয়। সেই উন্মিলিত চক্ষুর দ্বারা কল্পিত ইষ্ট বিগ্রহ দর্শন করিতে করিতে ঐ বিগ্রহের মধ্যে মন্ত্রার্থ মূলক রূপগুণ শক্তির কল্পনা ধীরে ধীরে অভ্যাস করতে হয়। মন্ত্রকল্পিত শক্তিশালী ইষ্ট দেবতার বিগ্রহটীকে অন্তশ্চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে করিতে অভ্যস্ত হলেই তখন মুর্ত্তিটীকে আর

দারুময়ী প্রস্তরময়ী মৃন্ময়ী বা ধাতুময়ী বলিয়া মনে হয় না।

শিষ্য :—বড়ই সুন্দর লাগ্ছে, কি বলিয়া মনে হয় গুরুদেব ?

গুরু :—মনে হয়—আমার পরমদয়াল-সজীব ইষ্টদেবতা সত্য সত্যই সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। এই খানেই এই ধ্যানরাজ্যে প্রবেশের পথেই সাধকের মন্ত্র চৈতন্ত হয়। মন্ত্র চৈতন্ত হলেই কল্পিত ইষ্ট বিগ্রহও চৈতন্তময় হয়ে উঠে। তখন প্রতি মন্ত্রটীর উচ্চারণে পুলক শিহরণ সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠে। তখন মন্ত্রটীর উচ্চারণে সজীব মূর্ত্তিটীকে মনে পড়ে, আবার সেই সজীব মূর্ত্তিটী মনে পড়লেই ইষ্টমন্ত্রটী আপনা হইতেই মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। এই খানেই নাম ও নামী অভেদ মনে হয়। তখন ঐ আনন্দ দায়ক মূর্ত্তিটীকে আত্মীয় বলেই মনে হয়। কত আকার ইঙ্গিতে কত রৌদ্র সৌম্য ভাবের বিকাশে সাধক ও দেবতার কত কথাই হয়। কি করে বৎস, এ সব জিনিষ ভাষা দিয়া বুঝাব। ভক্তিভাবে প্রণত হও। তা হলেই সেই অবাঙ্‌মনের অগোচর মা দয়া করে তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন, কৃপা হলে ধরাও দেবেন। কেবল প্রণত হও, কেবল প্রণত হও।

শিষ্য :—গুরুদেব, বড় আনন্দময় পথের সন্ধান পাচ্ছি, বলুন ঐ অবস্থায় কি সাধক সর্ব্বদাই অন্তশ্চক্ষু দ্বারা আনন্দময় বিগ্রহই দর্শন করতে পান ?

গুরু :—প্রথম প্রথম সর্ব্বদা মনোমত দর্শন হয় না বৎস। যে দিন ভাল ভাবে দর্শন হয় না, সাধকের মনে নিদারুণ অশান্তি জেগে উঠে, তীব্রজ্বালায় অস্থির হয়ে আপন মনে ছুটাছুটি করে। কখনও নদীর তীরে কখনও নির্জ্জন প্রান্তর পারে, কখনও বা মন্দিরে সাধক এক অজানা ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটাছুটি করে।

শিষ্য :—তারপর কি হয় ?

গুরু :—দয়াল দয়া করেন। ওগো, বিশ্বাস কর, আর না কর, শুনে রাখ, ভক্তের সেই জ্বালাময় প্রাণে স্পর্শ না করেই হাত বুলিয়ে দেন। বল দেখি, সে কেমন স্পর্শ।

শিষ্য :—ঐ অবস্থায় সাধক কতদিন থাকেন গুরুদেব ?

গুরু :—দিনের খবর জানি না বাবা। তবে এই জানি শ্রীগুরুর কৃপায় সাধক ঐ ভাবে অন্তশ্চক্ষুর দ্বারা বিগ্রহ দর্শন করতে করতে কিছুকাল মন্ত্রজপ চালালেই, তাঁরই অনুগ্রহে আরও উচ্চস্তরে উঠিয়া যান। ঐ কল্পিত বিগ্রহ যেন সাধককে হাত ধরিয়া তুলিয়া আপন অঙ্গে মিলাইয়া লন।

শিষ্য :—বিগ্রহ মিলিয়ে গেল, তখন সাধক কি দেখেন ?

গুরু :—ঐ অবস্থায় সাধক মূর্ত্তি হারাইয়া একটী জ্যোতি দর্শন করেন মন তখন বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু জ্যোতি তখন বহুরঙ্গে রঞ্জিত বহুরূপে রূপায়িত। সর্ব্বদা রাহুগ্রস্ত চন্দ্র সূর্য্যের মত কম্পমান। সাধক এখানে যে জ্যোতি দর্শন করছেন, উহা অসীম অনন্ত বটে, কিন্তু চঞ্চল কম্পমান অবস্থা। সব ডুবে গেছে, ঘর বাড়ী বিষয় সম্পদ এমন কি দেশ কাল পাত্র সব ডুবে গেছে, কেবল অহং-সত্তা দ্রষ্টা রূপে অবস্থান করছেন। কিন্তু কম্পমান। ইহাই ধ্যান ষষ্ঠদ্বার।

শিষ্য :—ঐ কম্পমান অবস্থা কখন স্থির হয়।

গুরু :—দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে ঐ চঞ্চল জ্যোতি এক দিন স্থির হয়ে যায়। ধ্যানের এই স্থির ভাবকেই ধারণা কহে। ইহাই যোগের সপ্তম দ্বার। এই সীমাহীন অন্তহীন স্থির মহাজ্যোতিতে তখন আর সেই বিগ্রহ খুঁজে পাওয়া যায় না। শাক্ত বৈষ্ণব শৈব গানপত্য সৌর এখানে সব একাকার, কেবল ঐ এক স্থির মহাজ্যোতি। ওগো, ধারণাক্ষেত্রে খৃষ্ট মুসলমান পৃথিবীর যে কোন সম্প্রদায় সব একাকার।

শিষ্য :—ঐখানে দ্রষ্টারূপে অহং-সত্ত্বা এখন কি করছেন ?

গুরু :—ঐ অহং এখনও কাউকে অনুসন্ধান করছেন। অসীম-জ্যোতির চাঞ্চল্য ঘুচে গেছে, স্থির হয়েছে, কিন্তু অহং এখনও স্থির হয় নি। সে 'অহং' মহাজ্যোতিকে ধারণ করে ধারণাক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও কিছু চাহিতেছে। সে সেই মহাজ্যোতির কেন্দ্রস্থ বিন্দুকে আশ্রয় করে বিশ্রাম নিতে চাচ্ছে।

শিষ্য :—এখানে মহাজ্যোতি যখন অসীম, তখন তার আবার কেন্দ্রস্থ বিন্দু কোথায় ?

গুরু :—মহাজ্যোতি অসীম হলেও, 'অহং' বর্ত্তমান থাকায় তার সত্ত্বা যখন পৃথক উপলব্ধি হচ্ছে, তখন তার বিরাট অঙ্গ আছে উহার কেন্দ্রও আছে, ইহা ধরে নিতেই হবে। অঙ্গটীর সমুদয় অংশ একযোগে দেখা গেলেও, কোন একটী অংশ দেখিতে হইলে, অন্য অংশটী দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিষ্য :—কেন গুরুদেব, এখানটা বেশ ধরতে পাচ্ছিনে।

গুরু :—খুব মন স্থির করে ধীরে ধীরে গ্রহণ কর বৎস। মনে কর—তুমি তোমার ইষ্ট দেবমূর্ত্তির মুখখানি একাগ্রচিত্তে দর্শন করিতেছ। নিশ্চয়ই এখন তাঁর চরণ দুখানি দেখিতে পাইতেছ না। চরণ দর্শন করিতে গেলে, মুখখানি দেখিতে পাও না। আবার যদি বিগ্রহের দক্ষিণ চক্ষুটী একাগ্রমনে দেখ, বাম চক্ষু, নাসিকা বা মুখের অন্যান্য অংশ দেখিতে পাইবে না। আবার তুমি যদি আরও একাগ্র চিত্ত হয়ে তোমার ইষ্টবিগ্রহের দক্ষিণ নেত্রের মাত্র মণিটী দেখ, তাহা হইলে, ঐ দক্ষিণ চক্ষুর অন্যান্য অংশ দেখিতে পাইবে না। এইবার তুমি যদি আরও আরও একাগ্রচিত্তে, ঐ দক্ষিণ নেত্রস্থিত মণির মধ্য-বিন্দুটীই মাত্র দেখ, তাহা হইলে, ঐ মণির অন্যান্য অংশস্থ অন্যান্য বিন্দুগুলি দেখিতে পাইবে না। এখানে তোমার বুদ্ধি যেমন মণির

মধ্য-বিন্দুতে আসিয়া নিজের সত্ত্বা হারাইল, কর্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিল, এক কথায় সমাহিত হইল, ঠিক তেমনি ধারণাক্ষেত্রে কিছুদিন থাকতে থাকতে মহাজ্যোতিতে সাধক ঐরূপ একটী বিন্দুতে নিজেকে অর্থাৎ সেই 'অহং' মাত্র সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলে ডুবে যায়, গলে যায়, সাধক ও সাধ্য এক হয়ে যায়—'ভাব্যভাবুকয়োবেকবৃত্তিঃ' (পঞ্চদশী) অর্থাৎ ধ্যাতা ও ধ্যেয় একবিন্দুতে সমাহিত হয়; উহারই নাম সমাধি-যোগের অষ্টমদ্বার। ইহাই ব্রহ্মদর্শনের প্রবেশ-পথ।

শিষ্য :—উহাই যদি প্রবেশ-পথ হয় গুরুদেব, ব্রহ্মদর্শন কবে পাওয়া যাবে ?

গুরু :—পূর্ণ দর্শন দেওয়া, না দেওয়া তাঁর দয়া, সবই তাঁর ইচ্ছা। কাউকে ঐ প্রবেশ-পথেই কিছু দর্শন দেন, উহাই ব্রহ্মাভাস। উহাই বৈশ্য-সাধকের অবস্থা। আবার কাউকে বহুজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-সংস্কারকে ক্ষয় করিয়ে প্রবেশ-পথ হইতে কিছুটা কাছে টেনে নেন, তিনি ক্ষত্রিয়সাধক নামে অভিহিত হন। আবার যাঁকে নিজ অঙ্কে তুলিয়া লইয়া চুম্বন দেন, তিনি ব্রাহ্মণসাধক নামে অভিহিত হন। ওগো, আমি বলি,—বহুদিন ঐরূপ দরখাস্ত হাতে করে ঐরূপ প্রবেশ-পথে যাওয়া আসা করতে হয়, আমার বিশ্বাস—এইভাবে প্রবেশ-পথে যাওয়া আসা বজায় রাখতে পারলে, একদিন এমন আসে, আর ফিরতে হয় না। ঐ যে ব্রহ্ম-সন্দর্শনের প্রবেশ-পথে এসে ফিরে যাওয়া, উহাই সবিকল্প সমাধি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সাধকগণ (সমাজে তিনি যে জাতিই হউন) কেহ তাঁকে স্পর্শ করিয়া কেহ তাঁর নৈকট্য লাভ করিয়া আবার কেহ প্রবেশ-দ্বার থেকে দর্শন করিয়া, এককর্ত্তৃত্ববোধে যোগস্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

শিষ্য :—তাহলে নির্বিকল্প সমাধি কাকে বলে গুরুদেব ?

গুরু :—যাঁরা দর্শন করিতে গিয়া বা নৈকট্য লাভ করিয়া, বা

তাঁকে স্পর্শ করিয়া তাঁর ইচ্ছায় এই কর্ম্মজগতে ফিরিয়া না আসেন, তাঁবাই নির্বিকল্প সমাধিস্থ হন। "যৎ সত্ত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম মম উচ্যতে।"

শিষ্য :—গুরুদেব, এ বিষয়ে আর একটী প্রশ্ন, ঐ যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সাধকের কথা বলিলেন, শূদ্র সাধক কাহাকে বলে?

গুরু :—যাঁরা শোকে অত্যন্ত অভিভূত হন, ঈশ্বর উপাসনায় বিমুখ থাকেন, সে যে জাতিই হউক তারাই শূদ্র। কাজেই শূদ্র কখনও সাধক হন না। আর যাঁরা যে জাতিই হউন, যদি সাধন ভজন, ঈশ্বর উপাসনা করেন, শোকে অত্যন্ত অভিভূত না হন, তাঁরা শূদ্র হতে পারেন না। ইহা সাধন-তত্ত্বের রহস্য। ইহাতে সামাজিক সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতি সাধনবিহীন গায়ত্রী-বর্জ্জিত হলেই তাঁরা সাধনক্ষেত্রে "কর্ম্ম-শূদ্র" নামেই অভিহিত হন।

শিষ্য :—ঈশ্বর উপাসনায় বিমুখ হলেই যদি সকল জাতি 'কর্ম্ম-শূদ্রত্ব' প্রাপ্ত হয়, তবে ঐরূপ সামাজিক বর্ণভেদ রেখে লাভ কি?

গুরু :—ভেঙ্গে ফেললে কোন লাভ নেই, তবু রেখে লাভ আছে বৎস। তালগাছ না থাকলে ও তাল-পুকুরের নাম ঘোচে না, একটী পদ্মফুল না থাকলেও, পদ্মপুকুর রোড, যেমন অতীত পদ্মপুকুরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সেইরূপ 'উচ্চ জাতিতে জন্ম আমার', এইরূপ স্মৃতি বহন করায়ও লাভ আছে। কি লাভ আছে, শুন্‌বে :—

সুপ্ত সংস্কার দীর্ঘ-জড়তা ভাঙ্গি;
জাগিবে একদা অন্তর মাঝে;
নিজ পরিচয় স্মরিয়া তখন,
সত্বর সাজিবে আপন সাজে।

শিষ্য :—যাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেননি, বা বিধিপূর্ব্বক পূজা জপ প্রভৃতি সাধন ভজন করবার সত্যই সুযোগ বা অবসর পান না, তাঁরা কি উপায়ে উদ্ধার হবেন, দয়া করিয়া বলুন।

গুরু :—মহাপ্রাণ ঋষি-প্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্ম উদারতায় পরিপূর্ণ। ছোট বড় সকলের কথাই চিন্তা করিয়াছেন; তাঁদের শাস্ত্রের উদ্দেশ্য,—মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; শোক তাপ দুঃখ-দৈন্যের হাত থেকে পরিত্রাণ করা। যাঁরা সত্যই দীক্ষা-গ্রহণের সুযোগ পান না, বিধিপূর্ব্বক ঈশ্বর উপাসনারও সুযোগ-সুবিধা পান না, তাঁহারা অনুরাগসহ ঈশ্বর-সেবা করুন, যেটুকু সময় পান, তাঁর গুণানুকীর্ত্তন করুন; তাহলেই ক্ষেত্র তৈরী হবে। সেবাধর্ম্ম কলিযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। উহাতে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, ঈশ্বর প্রসন্ন হন। দীক্ষিত হউন, আর অ-দীক্ষিত হউন, দীর্ঘদিন সেবাধর্ম্মের অনুশীলনে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়। শুদ্ধচিত্তই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে সমর্থ হয়।

শিষ্য :—গুরুদেব, ঐ যে ঈশ্বর-সেবা করবার উপদেশ দিলেন, ঈশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি না, কিভাবে তাঁর সেবা করিব?

গুরু :—দেখ, ঈশ্বরের তিনটী মূর্ত্তি সর্ব্বদা আমরা দেখতে পাই এবং মূর্ত্তি তিনটীর মধ্যে যেটীকে সেবা করে তোমার তৃপ্তি হয়, তাহার দ্বারাই ঈশ্বর-সেবা সম্পন্ন হবে।

শিষ্য :—কি কি তিনটী মূর্ত্তি গুরুদেব?

গুরু :—প্রথমটী শ্রীগুরু-মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী শ্রীদেববিগ্রহ-মূর্ত্তি, তৃতীয়টী শ্রীজগন্মূর্ত্তি। এই দৃশ্যমান্ জগতের জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা সবই তাঁর শ্রীজগন্মূর্ত্তি। নৃযজ্ঞ বা ভূতযজ্ঞের দ্বারা শ্রীজগন্মূর্ত্তির সেবা হয়ে থাকে। (সাধন সোপান প্রথম ভাগে দেখ)।

শিষ্য :—সেবা বলতে কি বুঝিব গুরুদেব? শ্রীবিগ্রহ সেবাদি কি করে করতে হয়?

গুরু :—তোমার সেবা বলতে তুমি যা বোঝ, 'তাঁর' সেবা বলতে তুমি তাই বুঝিও। তোমার যেমন শীত গ্রীষ্ম বোধ আছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ আছে, শ্রীভগবানের মূর্ত্তিটীরও সেই সব বোধ ঠিক ঠিক আছে। তুমি শীতকালে যেমন গাত্রে আবরণ দিয়ে তৃপ্তি পাও, গ্রীষ্মকালে তোমাকে বাতাস করলে, তোমার যেমন আরাম বোধ হয়, তুমি উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও পবিত্র পানীয় বা আরামদায়ক শয্যা পেলে তোমার যেমন তৃপ্তি, আরাম ও আনন্দ হয়, ঐ তিনটী মূর্ত্তির যে কোন মূর্ত্তিকে ঐ সব প্রদান করিলে, ঈশ্বরের সেইরূপ তৃপ্তি, আরাম ও আনন্দ হয়। তোমার গুণ-কীর্ত্তন মহিমা বর্ণনা করিলে বা তোমাকে কেহ মিষ্ট কথা বলিলে, অথবা তোমাকে কেহ চন্দন-চর্চ্চিত-কুসুমসুবাসিত করিলে তোমার যেমন আনন্দের সীমা থাকে না, তুমি যদি তোমার শ্রীদেব-বিগ্রহের স্তব-স্তুতি কর, অঙ্গসেবা কর, তাঁরও আনন্দের সীমা থাকবে না। তোমার প্রতি যদি কেহ অনুরাগী হন, সে ব্যক্তি যেমন তোমার প্রিয় হন, তুমি তাঁরও অনুরাগী হও, তুমিও 'তাঁর' তেমনি প্রিয় হবে। এইরূপ সেবার দ্বারাও ভগবানের নিকটস্থ হওয়া যায়। বৎস, ঐ তিনটী মূর্ত্তিকে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিও না। জ্ঞানময় গুরুর স্থূল মূর্ত্তি মনুষ্য-দেহেই প্রকট হয়, ইহাই শ্রীগুরুমূর্ত্তি। 'উপাসকানাং হিতার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—উপাসকগণের সুবিধার জন্য অব্যক্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়, সেই কল্পিত দেবরূপই শ্রীদেববিগ্রহ-মূর্ত্তি। তারপর দেখ,—অব্যক্ত ব্রহ্ম বহু হবার ইচ্ছা করেই ওতোপ্রোতভাবে জগৎরূপে পরিব্যাপ্ত, প্রতিভাত—ইহাই শ্রীজগন্মূর্ত্তি। একটী দুঃস্থের সেবা কর, তাঁরই সেবা করা হবে, একটী সুস্থের সেবা কর, তাঁরই সেবা করা হবে।

শিষ্য :—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁহাদের বিগ্রহাদি সেবার অধিকার নাই, সুযোগ নাই বা সময় নাই, তাঁহারা কিভাবে সেবা করবেন ?

গুরু :—তাঁরা পরম্পরা সম্বন্ধে সেবা করবেন, তাহলেও সে সেবা কার্য্যকরী হবে।

শিষ্য :—পরম্পরা সম্বন্ধে সেবা কাহাকে বলে ?

গুরু :—তুমি নিজে করতে পারছ না, অপরকে দিয়ে করাও বা যে করছে তাহার সহায়ক হও, তাহাকে উৎসাহিত কর, বুদ্ধি দাও, অর্থ সাহায্য কর ; তাহলেই এই পরম্পরা সম্বন্ধীয় সেবা তাঁর নিকট পৌঁছে যাবে।

শিষ্য :—আমি স্বহস্তে নিজে কিছুই করলাম না, কেবল উৎসাহ, প্রেরণা, বুদ্ধি বা অর্থ দিলাম, তাতেই আমি কেমন করে ফলভাগী হব, দয়া করে একটু পরিষ্কার করে দিন।

গুরু :—বেশ, মনে কর, এক নিভৃত স্থানে একটা পৈশাচিক নরহত্যা হচ্ছে ; তুমি বহুদূরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে ঘাঁটি আগ্‌লাচ্ছ, তোমার উদ্দেশ্য যাতে কোন লোক হঠাৎ উপস্থিত হয়ে ঐ নরহত্যার প্রতিবন্ধক না হয়, অথচ তুমি নরহত্যা নিজ চক্ষে দেখ্‌ছ না, স্বহস্তে কিছুই করছ না। আবার তোমার মত কেহ বা উৎসাহ দিচ্ছে, কেহ বা অস্ত্র এগিয়ে দিচ্ছে, আবার কেহ বা স্বহস্তেই নরহত্যা করছে। এইভাবে একটা নরহত্যা হয়ে গেল। জেনে রাখ বৎস, তোমরা সকলেই ঐ নরহত্যার পাপভাগী হবে। তুমি দূরে থাকিলেও পরম্পরা সম্বন্ধে ফলভাগী হবে।

শিষ্য :—সকলেই কি সমান পাপভাগী হব ?

গুরু :—নরহত্যা করিবার যে উদ্দেশ্য, তার তারতম্য অনুসারে ফলের তারতম্য হতে পারে। মোট কথা পাপ যখন অনুষ্ঠিত হয়েছে যে ভাবেই হউক, সেই পাপানুষ্ঠানের তোমরা সহায়তা করেছ, তখন

তার অংশ তোমাদিগকে গ্রহণ করতেই হবে। এইরূপ পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যানুষ্ঠান, উভয়ক্ষেত্রেই যাঁহারা সহায়ক, উৎসাহক, প্রযোজক, অর্থ-সাহায্যকারী, অনুমন্তা এবং কর্ত্তা তাঁহারা সকলেই পাপপুণ্যের অধিকারী হয়ে থাকেন।

শিষ্য :—গুরুদেব, আপনার কৃপায় বেশ বুঝলাম। নিজে স্বহস্তে সেবা করতে না পারলেও, লোক দিয়ে সেবাধর্ম্ম পালন করা যায়! সুন্দর ব্যবস্থা গুরুদেব।

গুরু :—হাঁ বৎস, কয়টা লোক তার স্বহস্তে সেবাধর্ম্ম সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। এই যে অগণিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, জলাশয়, সুবিস্তৃত পথ, পান্থশালা, দেবালয়, অতিথিশালা,—এইগুলির মূল প্রতিষ্ঠাতা বা যাঁদের অর্থ-সাহায্যে এইগুলি গড়ে উঠেছে, তাঁরা কে কোথায় চলে গেছেন, কিন্তু এইগুলির দ্বারা 'তাঁর' জগন্মূর্ত্তির ঠিক ঠিক সেবা আজিও হচ্ছে। বৎস, কেবল কায়ার দ্বারাই যে তাঁর সেবা হয় তা নয়, কায়, মন, বাক্য, এই তিনের দ্বারাই 'তাঁর' সেবা হয়।

শিষ্য :—এইজন্যই বুঝি বাক্‌সংযম একান্ত প্রয়োজন। কখন কাহাকে কি বলে ফেলা হয়, যার ফলে পাপানুষ্ঠান ঘটে যেতে পারে। আমার বাক্যের প্রভাবে পাপানুষ্ঠান হলেই, আমাকে ফলভাগী হ'তে হবে ত?

গুরু :—নিশ্চয়ই। তবে বাক্‌সংযম মানে নির্ব্বাক্ নহে বৎস।

শিষ্য :—তবে বাক্‌সংযম কাকে বলে গুরুদেব?

গুরু :—তুমি ত নিজেই তা বললে যে বাক্যের দ্বারা পাপে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মায়, জগতের অকল্যাণ হয়, সেই সব বাক্য মুখে না আনার নামই বাক্‌সংযম। অতি সতর্কতার সহিত ঐ সব বাক্যগুলি বাদ দিয়া তুমি দিবারাত্রি

যদি বাক্যালাপ কর, অপরকে ধর্ম্মকর্ম্মে প্ররোচিত কর, তোমার জগন্মূর্ত্তির সেবা করাই হবে। সংযম মানে উচ্ছৃঙ্খলা হইতে প্রতিনিবৃত্তি, শৃঙ্খলাকে সীমাবদ্ধ করা নয়।

শিষ্য :—আচ্ছা গুরুদেব, নিজে পুণ্যানুষ্ঠান না করে, কেবল অপরকে পুণ্যানুষ্ঠানে উৎসাহ দিলে, পরোপদেশে পাণ্ডিত্য হয় না কি?

গুরু :—নিশ্চয়ই। উহাকে আভিধানিক পণ্ডিত বলে। সে উপদেশ কেউ শোনে না বাপু। আমি মদ্যপান ক'রে মাতলামি করছি, অথচ সকলকে বলে বেড়াচ্ছি মদ খেও না বাবা, মদ খাওয়া বড় দোষ। এ কথা কে শুনবে? তেমনি নিজে পাপানুষ্ঠানে রত থেকে, অন্যকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ দিলে তাহাই বা কে শুনিবে?

শিষ্য :—তাহলে, নিজে দেব-সেবা না করিয়া কেবল উৎসাহ প্রেরণার দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধেই বা কেমন করে দেব-সেবা সম্ভব হয়? এ যে বড় সংশয়ে ফেলিলেন।

গুরু :—কিছুই সংশয় নয়, স্থির হয়ে বোঝ। তোমার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা অনুরাগটুকুই সবচেয়ে বড় কথা। পূর্ব্বেই বলেছি—উদ্দেশ্যের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে পাপ ও পুণ্যের তারতম্য ঘটে থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্র। তুমি অন্তরের সহিত মনে মনে জপ কর, দান ধ্যান তীর্থযাত্রা কর, সাধুকল্পনা কর, তোমার পুণ্যানুষ্ঠানই হবে। পক্ষান্তরে তুমি কার্য্যতঃ কিছু না করিয়াও মনে মনে হিংসা, দ্বেষ, কুৎসিত মতলব, অপরের অনিষ্ট চিন্তা করিলেও, মহাপাপভাগীই হইবে। কাজেই মনে মনে দেবসেবার অনুরাগ রেখে সেই কার্য্যে সহায়তা করলেই তোমার অন্তর্নিহিত গোপন অনুরাগটুকু ঐ সহায়তার ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠে দেব-সেবাই করবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেব-সেবা অর্থে তোমার সশ্রদ্ধ-শরীর দিয়া দেবসেবা, পরম্পরা সম্বন্ধে দেব-সেবা

অর্থে, তোমার মন, প্রচেষ্টা, শ্রদ্ধা, অনুরাগসহ অর্ঘ্যাদির দ্বারা দেবসেবা। অনুরাগ শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া শতকোটী অর্থ দান করিলেও বা শরীর ক্ষয় করিয়া সেবা করিলেও কোন সেবাই কার্য্যকরী হবে না।

পাপ ও পুণ্য।

শিষ্য :—যদি কেহ দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন বা কোন ধর্ম্মানুশীলনের আশ্রম তৈরী করে দেন, সেই ধর্ম্মস্থানে আসিয়া অন্য যদি কেহ সেই স্থান প্রভাবে পুণ্য অর্জ্জন করেন, তাহলে ঐ সব ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও পুণ্যের ফলভাগী হবেন ত ?

গুরু :—নিশ্চয়ই, এতে আর সন্দেহের অবসর কোথায় ?

শিষ্য :—আর ঐ সব ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে আসিয়া যদি কেহ পাপকার্য্য করেন, তাহলে প্রতিষ্ঠাতা পাপভাগী হবেন ত ?

গুরু :—না। ঐ সব ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার পবিত্র উদ্দেশ্যে কোন খাদ ছিল না। তিনি ধর্ম্মের নামে নিজেকে ঢেকে পাপানুষ্ঠান যাতে হতে পারে, এরূপ কোন গোপন মৎলব করে ঐ সব প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করেন নি। সেখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে-যাঁরা পাপ করবেন, তাঁরা স্বকৃত পাপের ভীষণ ফলভোগ করবেন। কিন্তু যাঁরা ঐ সব প্রতিষ্ঠানে আসিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিবেন, তাঁরা ত ফললাভ করবেনই, তা ছাড়া যাঁরা ঐ সব ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, অর্থ সাহায্য করেছেন, ধর্ম্মানুশীলনের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন, সেই সব ধর্ম্মবন্ধুগণও অন্য কর্ত্তৃক অর্জ্জিত পুণ্যের অংশভাগী হবেন। পক্ষান্তরে, বৎস, তুমি যদি পাপকার্য্য করিবার উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্ম্মের আবরণে নিজেকে ঢেকে যে কোন কার্য্যই কর না কেন, তার

অনুষ্ঠাতা তুমি, নিশ্চয়ই পাপভাগী হবে। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত একস্থানে এইরূপ পাপভাগী হয়ে পড়েছিলেন।

শিষ্য :—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাপভাগী হয়েছিলেন কোথায় গুরুদেব ?

গুরু :—কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন—"অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।" ইহার অর্থ—অশ্বত্থামা মারা পড়িয়াছে, একটী হাতী। ঐ হাতী কথাটি যাতে দ্রোণাচার্য্যের কর্ণগোচর না হয়, স্বপক্ষীয় দল সেই সময় একটা বাজনা বাজিয়ে দিয়েছিল। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় অমর পুত্রের মৃত্যু-সংবাদের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই মিথ্যা প্রয়োগ করায় স্বশরীরে স্বর্গে গিয়াও তাঁকে নরক দর্শন করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল।

শিষ্য :—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত' একটুও মিথ্যা বলেন নি গুরুদেব, সেইদিন অশ্বত্থামা নামে সত্যসত্যই ত' একটী হাতী মারা পড়েছিল।

গুরু :—হাঁ, ভাষায় মিথ্যা বলা হয়নি বটে, ভাবে বা উদ্দেশ্যে মিথ্যাই ঢাকা ছিল। ঐ যুদ্ধে কত নামের কত হাতী, ঘোড়া, কত রথী, পদাতিক প্রত্যহই মরছিল, যুধিষ্ঠিরের কি প্রয়োজন ছিল ঐ তুচ্ছ হাতীর নামটী দ্রোণাচার্য্যকে সে সময় শোনাবার। এমনভাবের ক্ষেত্র তৈরী ছিল, দ্রোণাচার্য্য যদি চির-সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনতে পান যে অশ্বত্থামা হত হয়েছে, তাহলেই তিনি বিশ্বাস করেন, যে তাঁর অমর পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। কিন্তু এই নিছক মিথ্যা কথাটী শ্রীগুরুর নিকট বলতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই জড়িয়ে-মড়িয়ে ভাষার সত্য আবরণে মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদটী ঐভাবে দ্রোণাচার্য্যের কানে তুলে দিলেন। ইহা ভাষার সত্য হইলেও উদ্দেশ্যে মিথ্যা ছিল, তাই নরক দর্শন করতে তিনি বাধ্য হলেন।

শিষ্য :—ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই ত' নিছক মিথ্যা কথা দ্রোণাচার্য্যের নিকট বলেছিলেন, তাঁরা ত' ওঁকে স্বর্গে গিয়া নরক দর্শন করলেন না, এ বৈষম্যের কারণ কি গুরুদেব?

গুরু :—এর কারণ একটু অন্য। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ তাঁর একান্ত ভক্ত পাণ্ডবগণ প্রকৃতই তাঁকে পূর্ণ নির্ভর করতে পেরেছেন কিনা, তাই পরীক্ষা করবার জন্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে ঐরূপ মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করেছিলেন। ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি ভক্তগণ ভেবেছিলেন,—শ্রীগোবিন্দ যখন আদেশ করছেন, তখন এতে মিথ্যাই বা কি, সত্যই বা কি, পাপই বা কি, পুণ্যই বা কি "গুরোবাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া।" গুরু গোবিন্দের আদেশ, ভাল মন্দ বিচার করতে নাই, কেবল পালন করতেই হয়। তাই গোবিন্দ-বিশ্বাসী ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি নিছক মিথ্যা বলিয়াও নিষ্পাপ। তাঁরা মিথ্যা বলিতেছেন, কি সত্য বলিতেছেন, এ বিচার তাঁদের ছিল না। ইহার অতীত শ্রীগোবিন্দের আদেশ মাত্রই তাঁরা পালন করলেন। তাঁরা জানতেন, গোবিন্দ সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাই সাক্ষাৎ গোবিন্দের ইচ্ছায় নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি ও কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে তৎকালে যোগস্থ হতে পেরেছিলেন, তাই তাঁরা নিষ্পাপ, স্বর্গে গিয়াও নরক দর্শন করেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে যুধিষ্ঠির তা পারেন নি।

শিষ্য :—যদি আমি কোনরূপ ইঙ্গিতের দ্বারাও কোন ব্যক্তিকে পুণ্য বা পাপপথে এগিয়ে দিই, তাহলে আমি পুণ্যের বা পাপের ভাগী হব ত?

গুরু :—নিশ্চয়ই। ধর্ম্মের প্রচারের দ্বারা, অর্থবাদমূলক বাক্যের দ্বারা অনেক মহাপুরুষগণ সমাজকে বা কোন ব্যক্তিবিশেষকে সৎপথে টেনে আনতে বা ঈশ্বরমুখী করে তুলতে, যে সব সতর্ক-বাণী বা যে সব সচেষ্টা রেখে গেছেন, তার ফলে আজ তাঁরা লোকান্তর-লোকে অবস্থান করিয়াও পুণ্যফলই প্রাপ্ত হচ্ছেন। পক্ষান্তরে পাপে প্রলুব্ধ

হ'তে পারে, ঈশ্বর-বিমুখ পথে অগ্রসর হতে সুবিধা পায়, এমন আকার ইঙ্গিতের ব্যবস্থা যাঁরা রেখে গেছেন বা রাখেন, তাঁরা জন্মান্তর ধরে সেই সব পাপের ফলভোগই করে থাকেন। বল দেখি বৎস, সৎপুত্র জন্মালে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যায় কেন, আর কুসন্তান জন্মালেই বা তাঁরা নরকে যান কেন? ওগো, টকো আমগাছ যদি রোপণ করে ফেল', তুমি রোপণের কারণ হলে বলেই তোমাকে চিরদিন গাল খেতেই হবে।

শিষ্য :—আচ্ছা গুরুদেব, এই সমাজের গুরু-পুরোহিতগণ, শিষ্য-যজমানকে ধর্ম্মে প্ররোচিত করে থাকেন, তাঁরা ত' পুণ্যই অর্জ্জন করে থাকেন?

গুরু :—উদ্দেশ্যে খাদ না থাক্‌লে পুণ্যই অর্জ্জিত হয়। ভণ্ডামি করে অথবা ধর্ম্মের নামে মিথ্যা প্ররোচনায় যদি শিষ্য-যজমানের নিকট হইতে অর্থ অর্জ্জনই উদ্দেশ্য হয়, তখন উহা মহাপাপ কর্ম্ম বলেই পরিগণিত হবে।

শিষ্য :—কাহারও ভাল করতে গিয়া যদি তাহার মন্দ হয়ে যায়, আমার পাপ হবে ত'?

গুরু :—না, তোমার পাপ হবে না, কারণ তোমার অভিপ্রায় মন্দ ছিল না। যেমন চিকিৎসকগণ রোগীকে নিরাময় করবার জন্য অস্ত্রোপচারাদি করিয়া থাকেন, তাতে যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তাতে নর-হত্যার পাপ হয় না। পক্ষান্তরে কাহারও অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে একটী কার্য্য করিলে, তোমার উদ্দেশ্যের ব্যর্থতায় তাহার ভালই হয়ে গেল, এক্ষেত্রে তোমার পাপই হইবে, যেহেতু তোমার মূল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য অসাধু ছিল।

শিষ্য :—যাহার অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, সে যদি মনে মনে সাধু-সঙ্কল্প পোষণ করে, তাহার পুণ্য হইবে ত?

গুরু :—নিশ্চয়ই। সাধুচিন্তা, সাধুসঙ্গ, সদালাপ, সকলের মঙ্গল কামনা, মনে মনে ঈশ্বরের আরাধনা, পূজা, জপ, এইসবগুলিই পুণ্যাত্মার লক্ষণ। মোট কথা, পাপ-পুণ্যের প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠান ব্যতীতও ঐগুলির পরিকল্পনা, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প অপ্রত্যক্ষ হইলেও পাপ ও পুণ্যের জনক বলিয়াই জানিবে।

শিষ্য :—উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বা সঙ্কল্প না থাকলেও কি পাপ পুণ্য জীবকে এসে আশ্রয় করে না?

গুরু :—নিশ্চয়ই করে। প্রাক্তন কর্ম্মের বশে জীবের ইচ্ছা না থাকলেও পাপ-পুণ্য অর্জ্জিত হয়ে থাকে। যেমন শিবরাত্রির উপাখ্যান,—সে রাত্রে ব্যাধ জানিত না যে তার আশ্রিত বিল্ববৃক্ষের মূলে শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত ছিল, সে জানিত না যে সেদিন শিবচতুর্দ্দশী তিথি; উপবাসী ছিল বটে, কিন্তু তাহার উপবাস করিবার পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প ছিল না, ঐ তিথিতে উপবাসী থাকিয়া শিবলিঙ্গে বিল্বপত্র প্রদান করিতে হয়, এ জ্ঞানও তাহার ছিল না। সবই তাহার অভিপ্রায়ের বাহিরে ছিল। তথাপি সে মহাপুণ্য অর্জ্জন করিল। ইহাই তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পোষিত, সঙ্কল্পিত অভিপ্রেত পুণ্যকর্ম্মের পবিত্র ফল। পক্ষান্তরে সুপণ্ডিত হলায়ুধ জন্মার্জ্জিত কুকর্ম্মের প্রভাবে নিজ পত্নীভ্রমে অন্ধকার রাত্রে বিমাতৃ অঙ্গ কামভাবে স্পর্শ করিয়াছিলেন। যার ফলে শাস্ত্রমতে তুঁষানল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এই অজ্ঞানকৃত ব্যভিচার পণ্ডিত হলায়ুধ অকপটে প্রকাশ করে সত্য সত্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এই তীব্র অনুতাপের দ্বারাই তৎক্ষণাৎ তাঁর পাপক্ষয় হওয়ায় অত্যাশ্চর্য্যভাবে সেই প্রজ্বলিত তুষানল হঠাৎ নির্ব্বাপিত হয়ে গেল। দেবগণ 'হলায়ুধপাত্রমপাত্রমস্তুৎ' এই দৈববাণী উচ্চারণ করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে তাঁর মস্তকে পুষ্প-বর্ষণ করিলেন।

শিষ্য :—অতি পবিত্র কাহিনী গুরুদেব। এখন দয়া করিয়া বলুন,—ঐ যে 'ব্যভিচার' শব্দ উচ্চারণ করিলেন, উহার প্রকৃত অর্থ কি?

গুরু :—শাস্ত্রে 'ব্যভিচার' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। শাস্ত্রমতে 'ব্যভিচার' শব্দের অর্থ, বিশেষভাবে আচার বা অধিকারকে উল্লঙ্ঘন করা। অর্থাৎ শাস্ত্রের বিশেষ বিধিগুলিকে না মানিয়া চলা, নিষিদ্ধ বিধিগুলিকে বিশেষভাবে মানিয়া চলা। শাস্ত্রে ইহার ব্যাপক অর্থ, কিন্তু সমাজে এই ব্যভিচার শব্দটীর অর্থ সঙ্কীর্ণ করা হয়েছে। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনকেই মাত্র সমাজ 'ব্যভিচার' আখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যভিচারের দ্বারা সমাজ দেহ জীর্ণ হয়ে যায়। উহা গোপন রাখিবার জন্য অগণিত ভ্রূণহত্যার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। সংসারে দারুণ অশান্তি দেখা দেয়, ব্যভিচারী ধনে-প্রাণে মারা যায়; ব্যভিচার একটী পাপ-কর্ম্ম, এইজন্য সমাজ আজও উহাকে ঘৃণা করে।

শিষ্য :—গুরুদেব, আমার প্রশ্ন করতে ভয় হয়, পূর্ব্বে বৈদিক যুগে, ঋষিযুগে, রামায়ণযুগে, মহাভারতযুগে, ব্যভিচারকে ঐভাবে ঘৃণা করা হত না কেন? এই দেখুন,—দেবগুরু বৃহস্পতি ভ্রাতৃবধূ গমন করেছিলেন, তিনি আজিও সর্ব্বদেব-পূজ্য বৃহস্পতি। মহর্ষি অত্রির পুত্র চন্দ্র গুরুপত্নী তারার গর্ভে বুধের উৎপত্তি করেন। চন্দ্রও পূজনীয়, জারজ পুত্র বুধও পূজনীয়। বিশ্বামিত্রের ঔরসে বেশ্যা গর্ভে শকুন্তলার জন্ম, শকুন্তলা পূজনীয়া সম্রাট-মহিষী। বিশ্বত্রাসবারণ অগণিতপরস্ত্রীগামী বিরাট ব্যভিচারী, যাঁর জন্য ভগবানকে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে কুণ্ঠিত মর্ত্ত্যধামে আসিয়া জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। কামজয়ী ত্রিপুরারি শঙ্করকেও একদিন মোহিনী-মূর্ত্তির পিছু পিছু ছুটতে হয়েছিল, তথাপি তিনি নিন্দিত বা অবজ্ঞাত হন নাই, আজও তিনি ত্রিলোক-পূজ্য দেবাদিদেব মহাদেব। যিনি গুরুপত্নীগমনকারী চতুর ব্যভিচারী,

তিনি দেবরাজ ইন্দ্র সহস্রলোচন। যিনি পরাশরের ঔরসে দিবাভাগে ধীবর-কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে উৎপন্ন, কানীন পুত্র, তিনি ভারতের নর-নারায়ণ, বেদ-বেদান্ত সর্ব্বশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব; এখানেই বা ব্যাভিচারে ঘৃণা কোথায়? ইহার কারণ কি গুরুদেব, একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন।

গুরু :—বেশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ বৎস। ঐরূপ ঘটনা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে আরও শত শত আছে। উহাদের প্রত্যেকটীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু তা বলে যে ঐরূপ ঘটনাগুলি ঘটে নাই, ঐগুলি যে রূপক এরূপ মনে করিও না। ঐগুলি সত্য ঘটনা। ব্যাপার হচ্ছে, এই যে নিখিল জীব জগৎ, তা দেবতা হউন, মুনি-ঋষি হউন, অন্য যে কোন শ্রেণীর জীব হউন, বা দুর্ব্বল মনুষ্যই হউন, সকলেই কম বেশী, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মের বহু হবার ইচ্ছা নিয়েই এই পরিদৃশ্যমান জগদ্ব্যাপারে চলেছেন। ঐ ব্যাপক ইচ্ছার অন্য আর একটী নাম, স্ত্রী-পুরুষঘটিত দৈহিকমিলনরূপ কাম। ঐ কামই জীবজগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্ব কারণ। উহার শক্তি অতি দুর্জ্জয়। উহা সময় সময় সংযত চিত্তকেও মোহাচ্ছন্ন করে। জগৎকল্যাণে ঐ কামকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অনাদিকাল হইতে গম্যাগম্য হিসাবে অনেক বিধিনিষেধ সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঐ কামজ মোহ এত বিধিনিষেধ সত্ত্বেও অতি সংযত জীবকেও তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে কম বেশী আচ্ছন্ন করে ফেলে, উহার এমনি দুর্দ্দমনীয় প্রভাব যে বয়স, অবস্থা বা সম্বন্ধের মর্য্যাদা সবক্ষেত্রে রক্ষিতও হয় না। সময় সময় যাঁরা অতি শক্তিশালী, তাঁদেরও ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যে ঐরূপ নিষেধ লঙ্ঘনরূপ পতন ঘটে থাকে। কিন্তু তাঁরা সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষ, কঠোর তাপস, কাজেই তাঁরা কদাচ মিথ্যার আবরণে ঐ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের কথা ঢাকিয়া সত্যের অপলাপ করতেন না।

শিষ্য :—তাঁরা নিজেই উহা প্রকাশ করিয়া দিতেন।

গুরু :—হাঁ বৎস, তাঁরা বীর, তাঁরা সত্যের সাধক, তাঁরা এত বড় অনন্যসাধারণ শক্তিশালী, এত বড় সত্যমুখি-মনোবলে বলীয়ান, ঐরূপ দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তের আঘাতজনিত ব্যভিচারটী অকপটে প্রকাশ করিয়া সত্যের পূজা করিতেন এবং যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় তপস্যাদি-রূপ-প্রায়শ্চিত্তও করিতেন। দ্বিতীয়বার ঐরূপ দুর্ব্বল-মুহূর্ত্ত না আসে, সেজন্যও সতর্ক থাকিতেন। তৎকালীন সমাজ ঐ সব সত্যাশ্রয়ী, অমিততেজা মহাপুরুষগণের তপোনিরুদ্ধ বীর্য্যজাত সন্তানকে সমাজে সযত্নে স্থান দিয়া সমাজের পুষ্টিসাধন করিতেন এবং যথোচিত সম্মানও দিতেন। সেইরূপ সন্তানের দ্বারা সমাজ বহু দিক দিয়ে পুষ্টিলাভই করিত।

শিষ্য :—সত্যাশ্রয়ী, শক্তিশালী, কৃততপা ব্যক্তির ক্ষণিক-দুর্ব্বল-মুহূর্ত্ত-প্রভাবিত-ব্যভিচার মার্জ্জনীয়, উহাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না, এই কথাই আপনি বলছেন?

গুরু :—হাঁ বৎস। সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য যে সমস্ত বিধিনিষেধ, অসাধারণ কৃততপা ব্যক্তিকে তা স্পর্শ করতেই পারে না। মনে কর, বিষ খাওয়া একটী পাপকার্য্য, উহাতে প্রাণহানি ঘটে থাকে; বিষদানকারীকেও আততায়ী বলা হয়। কিন্তু যদি কেহ নিজে আকণ্ঠ বিষপান করিয়া অগণিত জীবের প্রাণ বাঁচাইয়া মৃত্যুঞ্জয় হতে পারেন, তাঁর পক্ষে বিষ খাওয়া পাপ নহে। আরও মনে কর—পরস্ত্রী অপহরণ করা মহাপাপ, কিন্তু যিনি বহু বৎসর কঠোর তপোবলে বলীয়ান্ হইয়া বলপূর্ব্বক অগণিত পরকীয়া রমণী অপহরণ করিয়া, বিশ্বের দৈবশক্তিকে ম্লান করিয়া স্বর্গ জয় করিতে পারেন, আপাত চক্ষে তাঁকে মহাপাপী দেখিবেই; কিন্তু ভাবিয়া দেখ বৎস, যে ভগবানকে কোটী কোটী বৎসর ধ্যান করিয়াও ধরিতে পারা যায় না, সেই

ভগবান্ যদি ঐরূপ মহাপাপীর দ্বারদেশে আসিয়া তাকে নিজ অঙ্কে তুলিয়া লন, তখনও কি তুমি ঐ বিশ্বব্রাসবাবণকে মহাপাপী ব্যভিচারী বলিয়া ঘৃণা করিবে, না তোমার হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়া সেই অনন্যসাধারণ কঠোরতপা বীরভক্তকে পূজা করিবে ?

শিষ্য :—তাহ'লে দেখ্‌ছি গুরুদেব, মিথ্যাশ্রয়ী দুর্ব্বলব্যক্তি ব্যভিচারী হলেই পাপভাগী হয়, সমাজে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিতও হয়। আর দেখ্‌ছি—সবলের সহিত দুর্ব্বলের তুলনাই করা যায় না।

গুরু :—ঠিক ধরেছ বৎস, সত্যসেবীর ব্যভিচার বলিয়া কিছু নাই—সবই সত্য। দুর্ব্বলতাই ত' ব্যভিচারের পরিচায়ক, তুমি যতখানি দুর্ব্বল, ততখানিই ব্যভিচারী। দুর্ব্বলতাই পাপ, তুমি যে কারণে যে বিষয়ে দুর্ব্বল হও, বুঝিয়া লইও, তোমার মধ্যে পাপ আছে। ঐ শোন উপনিষদের ঋষি কি বল্‌ছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ," দুর্ব্বল ব্যক্তি কখনও ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী হয় না। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখ, শক্তিমত্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্ব্বত্র চলেছে, শক্তিমান্ দুর্ব্বলকে পশ্চাতে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। ঐ দেখ—একটী বলবান্ বৃক্ষ, তার তলদেশের ছোট ছোট দুর্ব্বল বৃক্ষগুলিকে কেমন দাবিয়ে নিজে দুর্ব্বারগতিতে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বড় হয়ে চলেছে। তুমি দুর্ব্বল, অনাহারে মরছ, বলবান্ তোমার আহার কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমান সমাজে দৃষ্টিপাত কর বৎস, কম বেশী অগণিত ব্যভিচার এখনও চলেছে। যাঁরা অর্থবলে তথাকথিত বিদ্যাবলে শক্তিশালী, সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া অবাধে ব্যাভিচার চালাচ্ছেন, আবার সেই ব্যাভিচারটুকু ঢেকে ফেলে সসম্মানে সমাজে বিচরণ করছেন। চিন্তা করিয়া দেখ বৎস, সমাজের উর্দ্ধতন শক্তিশালী ব্যাভিচারীরাই, যাঁরা অধস্তন দুর্ব্বল ব্যভিচারী তাঁদের বিচার করছেন। জেনে রাখ বৎস, এ সংসারে দুর্ব্বলের স্থান নাই।

শিষ্য :—মানব-সমাজ চিরদিনই কি এমনি দুর্ব্বল গুরুদেব?

গুরু :—না বৎস, মানব-সমাজ কোনদিনই এত দুর্ব্বল ছিল না। বৃক্ষ প্রাচীন হলেই তাতে ফল ভাল হয় না। কিন্তু সে বৃক্ষকে পরিপুষ্ট করবার চেষ্টা নাই। বৎস, দেশ থেকে, সত্যের উপাসনা, যাতে মরা মানুষ বেঁচে যায়, সেই উপাসনা তিরোহিত হয়েছে।

শিষ্য :—কে সত্যের উপাসনা তিরোহিত করে দিল, গুরুদেব?

গুরু :—বর্ত্তমানের ভোগ-সর্ব্বস্ব-হৃদয়হীন বাহ্য সভ্যতা। তাই বর্ত্তমান যুগে মানুষ এত দুর্ব্বল হয়ে গেছে। দেখাও দেখি বৎস, সমাজে এমন কয়জন পূর্ব্বযুগের ন্যায় সত্যাশ্রয়ী বীর ব্যভিচারী আছেন, যাঁরা মান-সম্ভ্রম, যশ, খ্যাতি, প্রসার-প্রতিপত্তি সুনামের ক্ষতির ভয় না করে, তাঁদের ক্ষণিক দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তের অথবা অভ্যাস ব্যাভিচারের কথা গোপন না রেখে আকণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করতে পারেন?

শিষ্য :—হাঁ গুরুদেব, পূর্ব্বযুগের ন্যায় এমন সত্যাশ্রয়ী ব্যাভিচারী খুব অল্পই দেখা যায়, বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এর প্রতিকার কি গুরুদেব?

গুরু :—সে অতি বিস্তীর্ণ গভীর গবেষণা। মোট কথা, গোড়ায় গলদ হ'য়েছে। সমাজ সাধনা হারিয়েছে। আসুরিক সভ্যতায় বিভোর, যার পরিণাম ধ্বংসশীলতা, যার অবশ্যম্ভাবী ফল বিশ্বজনীন অশান্তি। সত্যহীন সভ্যতা ছদ্মবেশী মৃত্যু বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। সাধনাই মানুষের মধ্যে সত্যের আলো জ্বেলে দেয়, কাজেই সাধনা না থাকলেই সব অন্ধকার। এখন সত্য কথা বলতে কেহ সাহস করে না, আর কেহ সত্য বলিলেও তাহা লোকে বিশ্বাস করে না। অধিকাংশের মনোভাব ঐরূপ

চলেছে। যদি কোন ব্যাভিচারী বা মহাপাপী নিজের দুষ্কার্য্যের কথা সমাজের নিকট ব্যক্ত করেন, তিনি অধিক নির্য্যাতীত ও অত্যন্ত ঘৃণিত হন। কাজেই যাঁরা মান-সম্ভ্রমের ভয় রেখে ভদ্রলোকের মত বাঁচতে চান, তাঁরা দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তের দুষ্কৃতির কথা গোপন রেখেই চলেন। পূর্ব্বে সত্যমুখী সবল সমাজে পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হলে, উহা প্রকাশের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল, এখন দুর্ব্বল সমাজে পাপকার্য্য ঢেকে ফেলে ধার্ম্মিক সাজাই প্রথা হয়েছে। অবশ্য সমাজে সকলেই সমান পাপী নহেন, সকলেই যে ব্যভিচারী, তাও নহেন। এমন অনেক ক্ষেত্রে নিরপরাধ তেজস্বী ব্যক্তিরাও সমাজে নিগৃহীত হয়েছেন।

শিষ্য :—কেন গুরুদেব, নিরপরাধ ব্যক্তিকে সমাজ এমনভাবে সাজা দেন ?

গুরু :—স্থানে স্থানে দেখা যায়, সমাজের বা দেশের প্রভুত্ব-বিলাসী তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তি বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি কাহাকেও তাঁদের স্বার্থের মতের বা দলের প্রতিকুলতা করিতে দেখেন, অথবা মাথা উঁচু করে উঠতে দেখেন, তাহলে সেই আত্মম্ভরি ব্যক্তিগণ প্রতিপক্ষ ব্যক্তির দুর্ব্বলতার ছিদ্রপথের সূত্র ধরিয়া যতটা সম্ভব মিথ্যা কলঙ্ককালিমায় ভরিয়ে দেন, কিছুদিন দাবিয়ে রাখেন, সম্ভব হইলে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেন দশচক্রে ভগবান যেমন ভূত হয়েছিলেন, প্রতিপক্ষ ব্যক্তিও দিনকতক 'সমাজ-চক্রে' সেইরূপ হীন হয়ে থাকেন সে যাহা হক বৎস তুমি সাধক, তোমার কর্ত্তব্য শুনিয়া রাখ—ব্যাভিচারকে চিরদিনই দূরে রাখিবে, ব্যাভিচার কোন দিন সমর্থন করিও না। কিন্তু স্মরণ রাখিও, অপরাধী ব্যক্তি সাজা না পায় সেও ভাল, কিন্তু নিরপরাধ ব্যক্তি তোমার দ্বারা কোন দিন অপমানিত বা ব্যথিত না হন। নিরপরাধ ব্যক্তি তোমার দ্বারা অযথা

ব্যথিত হলে তুমি মহাপাপভাগী হবে, সাধন-পথ থেকে তুমি বিচ্যুত হবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হবে।

শিষ্য :—উহা কি এতই পাপ?

গুরু :—হাঁ বৎস। নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী করার চেয়ে বড় পাপ আমি কল্পনা করতে পারি না। লোকের কথা বা গুজব শুনিয়া বা অনুমান করিয়া সত্য অবধারণ করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। লোকমত প্রায় বিভ্রান্তিকারী, উহা তোমার সাধন-সোপানে বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াবে। আরও একটী কথা শুনিয়া রাখ বৎস, যদি কোন দিন সুদূরাচার মহাপাপী, মহা ব্যাভিচারী প্রকৃত অনুতপ্ত হ'য়ে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, নির্ম্মম সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিও না, চরিতাপ-হারি-গঙ্গাবারি দিয়ে ধৌত করে বুকে তুলে নিও। সেই সত্যমুখীকে আশ্রয় দিতে সমাজের পায়ে ধরে কেঁদো, এইভাবে সত্যের পূজা করিও, তোমার সাধন-সোপান সুগম হয়ে উঠবে। বৎস, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, একদিন এই দুর্ব্বলভারতের সবল সত্যদর্শী গৌতম ঋষি, ব্যভিচারিণীর পুত্র সত্যকামকে সত্যসেবী দেখে, শত উপহাসের মধ্য থেকে পবিত্র বলে বুকে তুলে নিয়ে তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়েছিলেন। সাধকের সাধন-সোপানে উঠতে একমাত্র পাথেয় সত্য-সেবা, সত্যানুরাগ।

শিষ্য :—গুরুদেব, পাপক্ষয়ের কি কি উপায় আছে?

গুরু :—পথ ও মত বহু আছে। বিবিধ প্রায়শ্চিত্তেরও বর্ণনা আছে। পাপের অধিকারীভেদে পাপের লঘুত্ব গুরুত্ব আছে। তবে মোটামুটি জেনে রাখ—"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যায়নেনচ। পাপ-কৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি।" ইহার অর্থ—পাপী নিজ পাপ প্রকাশের দ্বারা, অনুতাপের দ্বারা বিধিবোধিত ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পুণ্য-কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গীতা,

চণ্ডী প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার দ্বারা পাপমুক্ত হন, অথবা এই সকল অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে, ভূমি স্বর্ণাদি দান বা অর্থাদি দানের দ্বারাও নিষ্পাপ হইতে পারা যায়। ইহাই সাধারণ অধিকারীর পক্ষে ব্যবস্থা। ইহার উপর এক চরম ব্যবস্থা আছে, যাহা লাভ করিতে পারিলে শত শত জন্মের সমুদয় পাপ তুলায় অগ্নিসংযোগের ন্যায় ভস্ম হ'য়ে উড়ে যায়।

শিষ্য :—গুরুদেব, দয়া করে বলুন—সে কি পবিত্রব্যবস্থা।

গুরু :—বৎস, প্রথম থেকে যা শুনে আস্‌ছ—সেই একঘেয়ে প্রাচীন কথা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা।

শিষ্য :--এখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান কাকে লক্ষ্য করছেন?

গুরু : এ পর্য্যন্ত দিবারাত্র যা বলে এসেছি, তাকেই লক্ষ্য করছি। যে জ্ঞানে অহং কর্ত্তা, এই খাদটুকু মিশান নাই, তাহাই বিশুদ্ধজ্ঞান। ভক্ত হও, শরণাগত হও, যোগস্থ হও, অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর, কর্ম্মফলে অনাসক্ত হও, এই সব বড় বড় কথার প্রকৃত মর্ম্মার্থ কোনদিনই কিছুতেই বোঝা যাবে না; যতক্ষণ তোমার নিজ মিথ্যা কর্ত্তৃত্বের মিথ্যা অভিমান থাক্‌বে।

শিষ্য :—কেন গুরুদেব, কর্ত্তৃত্বের অভিমান না ছাড়লে, ভক্ত বা শরণাগত হওয়া যায় না?

গুরু :—বেশ, চেষ্টা করে দেখ। মনে কর—তুমি সত্যকার একটী ভক্ত হতে চাও, এক পয়সার ফুল তুলসী দিয়ে খানিকটা ভক্ত হতে চাও না, প্রকৃতই ভক্ত হতে চাও। তোমার সবটুকু তোমার প্রিয়তম ইষ্টদেবকে দিয়ে তৃপ্ত হতে না পারলে, তোমার বিশুদ্ধভক্তি কোন দিন আস্‌বে না। পনর আনা তিন পয়সা তোমার নিজের গাঁটে রেখে, বিশুদ্ধ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভক্তি আস্‌তে পারে না। আবার যতক্ষণ বিশুদ্ধ ভক্তি, অর্থাৎ সেই নিজ-সর্ব্বস্ব

কর্ত্তৃত্ববোধ-বিহীন ভক্তি না আস্‌ছে, ততক্ষণ তুমি প্রকৃত ভক্ত হতে পারলে না; প্রকৃত আত্মহারা ভক্ত হ'তে না পারলে, ভক্তের ভগবান বলা চলে না। মুখে বল্‌তে পারি বটে, কিন্তু সত্যকার বলা হয় না,—কাজেই ঐরূপ পনের আনা তিন পয়সা হাতে রাখা ভক্তের ডাকে ভগবান্ ঐ এক পয়সার মতই আসেন।

শিষ্য :—শরণাগত হতে হলেও কি ঐরূপ ব্যাপার?

গুরু :—হাঁ বৎস, তোমার ব্যক্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্বটুকু হাতে রেখে শরণাগত হওয়া যায় না। গীতায় তিনি বলেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। সর্ব্বধর্ম্মান্ অর্থে, সর্ব্ববৃত্তিগত বিচ্ছিন্ন মিথ্যা কর্ত্তৃত্ববোধ, যাহা এতদিন শ্রীমান্ অর্জ্জুন নিজেই ভোগ করছিলেন, সেইটুকু দিয়া শরণাগত হতে উপদেশ দিলেন। আর ঐটুকু দিতে পারিলে সর্ব্বপাপ হইতে ভক্তকে রক্ষা করিবেন বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞাও ক'রলেন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই মহাবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও বৎস।

শিষ্য :—শরণাগত হওয়া, তাহলে খুব কঠিন ব্যাপার।

গুরু :—নিশ্চয়ই। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের কথা স্মরণ কর বৎস। লোকারণ্যকুরুসভামধ্যে দাঁড়িয়ে সেই একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী ব্যাধভয়ে-হরিণীর ন্যায় ব্যাকুলিত-প্রাণে বিপদ-হরণ গোবিন্দকে ডাকিতে ডাকিতে দুর্ম্মদ দুঃশাসনের হাত থেকে যতক্ষণ নিজ বস্ত্র দুই হস্তে নিজ শক্তিতে প্রবল প্রচেষ্টায় আগ্‌লাইতে লাগিলেন, ততক্ষণ সেই ভক্তবৎসল গোবিন্দ তাঁর সহায় হন নাই। তারপর এক হাত দিয়া কটিদেশের বস্ত্র শক্ত করিয়া টিপিয়া এক হাত উর্দ্ধে তুলিয়া যখন শোকস্তমানা দ্রৌপদী অস্থির হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেন, তখনও নিষ্করুণ ভগবান্ দ্রৌপদীর এক হাত কটিদেশে টিপে রাখায়, পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয়নি বলে, দয়া করেন নাই। শেষে হা গোবিন্দ,

হা গোবিন্দ বলিয়া বিগলিতঅশ্রুধারাসিক্তবদনে দ্রৌপদী সর্ব্বপ্রচেষ্টা সর্ব্বকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজ লজ্জা রক্ষার সম্পূর্ণ ভারটুকু ভগবানকে দিয়া যখন দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া দাঁড়াইলেন, তখন করুণাময় ভগবানের আসন টলিল, শরণাগতাকে রক্ষার জন্য দ্রৌপদীর কটিদেশে অলক্ষ্যে অবস্থান করিয়া, অযুত অযুত হস্ত পরিমিত বসন যোগাইলেন। দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ হইল। দেখ বৎস, এতটুকু কর্তৃত্ব হাতে রাখিলে শরণাগত হওয়া যায় না।

শিষ্য :—আপনার কৃপায় বেশ বুঝলাম। এখন দয়া করে বলুন—অনাসক্ত বা কর্ম্মফলে আসক্তিবিহীন হয়ে কর্ম্ম করতে হলেও কি পূর্ণ কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে হবে ?

গুরু :—নিশ্চয়ই। কর্ম্মের কর্ত্তাই ত' কর্ম্মফলের ভোক্তা। তুমি যতই তর্কবিতর্ক কর না কেন, শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে,—কর্তৃত্ববোধ নিজস্ব হলেই উহার ফল-বোধও নিজস্ব হবে। কাজেই কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য হ'তে হলেই ঐ কর্ম্মফলের উৎপাদক কর্তৃত্বেও আসক্তিশূন্য হতেই হবে। নতুবা উহা কিরূপে সম্ভব হতে পারে। আবার কর্তৃত্বে আসক্তিশূন্য হতে পারলেই পাপ-পুণ্যের অতীত হতে পারবে। তখনই তোমার সত্যদর্শন ঘটবে।

শিষ্য :—বুঝলাম। কিন্তু জীবের কর্তৃত্ববোধ না থাকলে জীব কর্ম্মই বা কি করে সম্পন্ন করতে পারে ?

গুরু :—এইজন্য বহু পূর্ব্বেই বলেছি—এক কর্তৃত্ববোধই যোগ ; একেবারে কর্তৃত্ব ত্যাগ নহে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বে নিজ কর্তৃত্ব মিলাইয়া দেওয়া, ইহারই নাম যোগস্থ হওয়া। যেমন, বাবুর বাড়ীর ঝি, চাকর, যেমন পরের ধনে পোদ্দারী। ঝি, চাকর বাবুর প্রতিনিধি হয়ে ছেলে মানুষ করছে বটে, কিন্তু তারা মনে প্রাণে জানে, বাবুর ছেলে। ছেলে মরলে, বাবুর ছেলেই মরবে ; ছেলে কৃতবিদ্য

হয়ে দিগ্বিজয়ী হলে বাবুর ছেলেই হবে। পোদ্দারের দশাও ঠিক ঐরূপ।

শিষ্য :—তাহলে গুরুদেব, ঈশ্বরে নিজ স্বাতন্ত্র্য কর্ত্তৃত্বটুকু অর্পণ করে তাঁর সঙ্গে এক কর্ত্তৃত্ববোধসম্পন্ন হয়ে যোগস্থ হতে না পারলে, ভুক্তাভুক্তকর্ম্মফলের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নাই, ইহাই ত সিদ্ধান্ত হইল?

গুরু :—হাঁ বৎস। জপতপ কর, দান-ধ্যান তীর্থযাত্রা কর, পূজা, হোম, যাগ-যজ্ঞ কর, ব্রতনিয়ম উপবাস প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা অভ্যাস কর—এইগুলি তাঁর পূর্ণকর্ত্তৃত্বের সম্যগনুভূতির সহায়ক বা উত্তরসাধক। ওগো, তুমি মনে প্রাণে অনুভূতির সহিত তাঁর কর্ত্তৃত্ব মেনে নিলেই, সংসারে তুমি কর্ত্তা হয়েও অ-কর্ত্তা হবে, জীবন্মুক্ত হবে।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।

শিষ্য :—আপনার কৃপায় বেশ বুঝলাম। কিন্তু গুরুদেব, একটু সংশয় হচ্ছে, ঐ যে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ না করেই আমরা বলি—তুমি কর্ত্তা, তোমার ইচ্ছায় জগৎ চলছে, তুমি জগন্মূর্ত্তি। ঠিক ঠিক শরণাগত না হ'য়েই আমরা বলি,—"হে শরণাগত পালক, হে ভীতিহরণ," এগুলি কি মিথ্যা বলা হয় না? এগুলি কি আমাদের ভণ্ডামি নয়? এগুলি কি ঠিক আমাদের প্রাণের কথা?

গুরু :—হাঁ বৎস, ঠিক ধরেছ। ঐগুলি মিথ্যা, ঐগুলি ভণ্ডামি, ঐগুলি প্রাণহীন উক্তি। কিন্তু বৎস, সত্যে উপনীত হতে হলে, প্রথম প্রথম ঐরূপ মিথ্যার ভিতর দিয়েই চলতে হয়। একদিন অভ্যাসের ফলে ঐ সত্যমুখী মিথ্যাই সত্যের ছোঁয়াচ পেয়ে সত্যের

রূপ গ্রহণ করে। সত্য পরশ পাথর কিনা, যা ছোঁবে তাই সত্য হয়ে যাবে।

শিষ্য :—মিথ্যাবাদী সত্যদর্শন করবে? ভণ্ডামি করে ভগবান পাবে, এ আপনি কি বল্‌ছেন?

গুরু :—স্থির হয়ে শোন বৎস, উত্তেজিত হয়ো না। সত্য, চিরশান্ত, নির্ম্মল, উত্তেজনায় তার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। সাধক যখন উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে ভোজনে ভ্রমণে সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে বা লক্ষ্য না করে তাঁর পবিত্র প্রসঙ্গ, অথবা তাঁর নামরূপ কীর্ত্তন পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেন, তখন তিনি মিথ্যাবাদী বা ভণ্ড হতে পারেন, কারণ তখনও তিনি শিক্ষানবীশ, সত্যে উপনীত হতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ সত্যানুসন্ধিৎসু মিথ্যাবাদী ভণ্ড সাধকই দীর্ঘ অভ্যাসের ফলেই একদিন উপলব্ধি করিবেন, 'ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, ঈশ্বরই ইচ্ছাময়, ঈশ্বরই সত্য। অভ্যাস না করিলে, কোনদিনই কেহ হঠাৎ ঐ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সাধক যখন দীক্ষাদি গ্রহণ ক'রে উপাসনায় বসেন, তখন মিথ্যাই উপাসনা করা হয়, তখন প্রথমতঃ উপাসনায় মন বসে না। সাধক তখন মিথ্যাই মন্ত্র উচ্চারণ করেন, যেমন পাঠশালায় শিশু ছাত্রেরা অন্যমনস্ক হ'য়ে নামতা মুখস্থ করে, কিছুই বোঝে না। শিশুরা যেমন দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে মুখস্থ নামতার সাহায্যে একদিন বড় বড় অঙ্কগুলির সত্বর সমাধান ক'রে, নামতার প্রয়োজনীয়তা ও স্বরূপ উপলব্ধি করে, সাধকও তেমনি ঐ মিথ্যা মন্ত্র উচ্চারণের দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে একদিন ঐ অভ্যস্ত মন্ত্রের মধ্যে চিৎশক্তির বা সত্যের সন্ধান পান। তখন সাধকের ঐ মিথ্যা উচ্চারিত মন্ত্রই চৈতন্যময় হয়ে উঠে—সাধক সত্যদর্শন করেন। তাই বল্‌ছি—সত্যদর্শনের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যিনি যত বড় উগ্র সাধক হউন, কিছু না কিছু অসত্য থাক্‌বেই; সত্যের পবিত্র

স্পর্শে অ-সাধকগণের ঐ উপহসিত মিথ্যা উপাসনা, ঐ অবজ্ঞাত ভণ্ডামিই একদিন সত্যেরই রূপ ধারণ করে থাকে। ওগো, সত্য সত্য পূজা, হোম, জপ যেদিন হবে, তারপর ঐগুলির আর প্রয়োজন থাকে না। পূর্ণ আন্তরিক সত্য উপাসনা, বহুজন্ম পরে সাধক-জীবনে মাত্র একদিনই ঘটে থাকে। পূর্ণতা প্রাপ্তির পর আর খণ্ডের প্রয়োজন হয় না। স্থির জেনো বৎস, খণ্ড খণ্ড উপাসনাগুলিই আন্তরিক উপাসনার উদ্যোগ-পর্ব্ব।

শিষ্য :—এখন দেখ্‌ছি, কোন কাজ ব্যবহারিক জগতে যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, উহা যদি সত্যমুখী হয়, তার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, পরমসুখদ।

গুরু :—হাঁ বৎস, খুব লক্ষ্য রাখ্‌বে—উদ্দেশ্যে যেন গলদ না থাকে। সকলকে ফাঁকি দিতে পার, ভুল বোঝাতে পার, প্রতারিত করতে পার, কিন্তু তোমার মনকে পারিবে না। জেনে রাখ বৎস, সাধন-সোপানে অগ্রসর হতে হলেই তুমি যে যুগের মানুষ হও না কেন, সত্যমুখী হয়ে চল্‌তে হবে, তোমাকে সত্যকালের মনোবৃত্তি পোষণ করতে হবে।

শিষ্য :—সত্যযুগে কি সকলেই ধার্ম্মিক ছিলেন, সে কালে কি পাপ বা মিথ্যা বলিতে কিছু ছিল না?

গুরু :—অসম্ভব। যেখানে সৃষ্টি, সেখানেই বৈচিত্র্য। আলোর পাশে আঁধার, সুখের পর দুঃখ, বিদ্বানের পাশে মূর্খ, ধনীর পাশে দরিদ্র, সুস্থর পাশে অসুস্থ না থাক্‌লে যেমন কোনটীর প্রকাশ হয় হয় না, তেমনি অধার্ম্মিক বা পাপী না থাক্‌লে, ধার্ম্মিক বা পুণ্যাত্মার কেমন করে প্রকাশ বা পরিচয় হবে? কাজেই সত্যযুগে ধার্ম্মিকও ছিল, অধার্ম্মিকও ছিল। নতুবা সত্যযুগ প্রকাশই পেত না।

শিষ্য :—সে যুগেও কি অধার্ম্মিক ছিল? বড় আশ্চর্য্য কথা!

গুরু :—ছিল বৈকি বৎস। সত্যযুগে দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে গর্ভিণীর গর্ভ বিদীর্ণ হয়েছিল; স্নেহের পুত্তলী প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করা হয়েছিল, উন্মত্ত হস্তি-পদতলে তাঁকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, ধার্ম্মিকের পক্ষ যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সবংশে তাঁদের নিধন করা হয়েছিল, দৈত্য অত্যাচারে ভগবানের আসন টলেছিল, তাঁকে অবতার গ্রহণ করতে হয়েছিল। আবার বিশুদ্ধ-ভক্তিমান্ প্রহ্লাদের ভক্তিরসে ত্রিভুবন ভেসেছিল, আনন্দে পরিপ্লুত হয়েছিল।

শিষ্য :—তবে সত্যযুগের সঙ্গে আর এই যুগের পার্থক্য কি ?

গুরু :—বিরাট পার্থক্য। সত্যযুগে যাঁরা ধার্ম্মিক ছিলেন, ভিতরে বাহিরেই ধার্ম্মিক ছিলেন। আবার যাঁরা অধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁরাও ভিতরে বাহিরেই অধার্ম্মিক ছিলেন; সত্যের আবরণে ঢেকে অধর্ম্ম করতেন না। সে যুগে সত্যমুখী ধার্ম্মিক ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যে পাপানুষ্ঠান করলেও তাহা অকপটে প্রকাশ করে সত্যযুগের মহিমা ফুটিয়ে তুলতেন। সত্যযুগে সর্ব্বত্র সত্য ছিল। সে যুগে পাপ গোপন ছিল না, দোষগুলা ঢেকে রাখা হত না। সে যুগে সত্যের অভিনয় ছিল না; যাহা মিথ্যা, তাহাও সত্যসত্যই মিথ্যা ছিল।

শিষ্য :—ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবস্থা কিরূপ হইল ?

গুরু :—ত্রেতাযুগে সত্যপাদ ভঙ্গ হইল; ত্রিপাদ সত্য, একপাদ মিথ্যা মিশ্রিত হইল। আবার দ্বাপরে সত্য দ্বিপাদ ভঙ্গ হইল, অর্দ্ধ-সত্য, অর্দ্ধ-মিথ্যা একই লোকের মধ্যে চলিতে লাগিল।

শিষ্য :—ত্রেতায় সত্যপাদ ভঙ্গ হইল, দ্বাপরে দ্বিপাদ ভঙ্গ হইল, ইহা কেমন করিয়া বুঝিব ?

গুরু :—ঐ সব কালের মূল উপাখ্যান-ভাগ দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায়। যদিও কালপ্রভাবে অনেক আবর্জ্জনা যাহা 'প্রক্ষিপ্ত'

বলিয়া কথিত, এ সে পড়ে উহার কলেবর বৃদ্ধি করেছে; যাত্রা, থিয়েটার, তরজা, কবির প্রবর্ত্তকগণের যথেচ্ছার সীমাহীন অসম্ভব কল্পনায় মূল বস্তু ঢাকা পড়েছে; সত্য মিথ্যা বুঝিবার অবস্থা নাই, তথাপি যুগপ্রভাবের কথা ধীরভাবে চিন্তা করিলে কতকটা মৌলিক ভাবের সমাধান করা যায়।

শিষ্য :—দয়া করিয়া আপনি কতকটা বুঝিয়ে দিন।

গুরু :—আচ্ছা শোন। সত্যযুগের দৈত্যাধিপতি শুম্ভ-চরিত্র, ত্রেতার রাক্ষসাধিপতি রাবণ-চরিত্র, দ্বাপরে দুর্য্যোধনাদি রাজ-চরিত্র আলোচনা কর। ত্রৈলোক্যাধিপতি দৈত্যরাজ শুম্ভ, দূতমুখে যখনই শুনিলেন—অলোকসামান্যা এক নারী (দেবী ভগবতী) রূপের প্রতিভায় হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হয়েছেন, তখনই সুগ্রীব নামে এক মিষ্টভাষী দূতকে পাঠাইয়া দেবী-সকাশে নিজ শক্তিমত্তার ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ পরিচয় দিয়া পত্নীরূপে তাঁকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। নারী উপভোগ করিবার লালসায় উন্মত্ত হয়ে দৈত্যরাজ হতে পারে কুৎসিত প্রস্তাব, কিন্তু সরল সত্য-স্বাবলীনচ্ছন্দেই অর্থাৎ মনোবৃত্তিতে পর্দা না টেনেই তাহা প্রকাশ করেছিলেন।

শিষ্য :—দেবী সেই গর্হিত প্রস্তাব শুনিয়া কি বলিলেন? নিশ্চয়ই দৈত্যরাজকে তিরস্কার করেছিলেন।

গুরু :—না বৎস। প্রস্তাব গর্হিত হলেও তাতে সত্য মাখান ছিল। কোথাও সত্যের গন্ধ পেলে, দেব-দেবী তিরস্কার ত' দূরের কথা, তাঁরা বুকে তুলে নিয়ে পুরস্কার দেন। তিনি ঐ প্রস্তাব শুনিয়া একটু হাসিয়া দূতকে বলিলেন—'সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র, মিথ্যা কিঞ্চিদ্বয়োদিতম্' ইত্যাদি। অর্থাৎ হে দূত, তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, উহা সত্য, একটুও মিথ্যা বল নাই। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা

পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কাহাকেও পতি ব'লে গ্রহণ করিতে পারি না।

শিষ্য :—হাঁ গুরুদেব, সত্যযুগের এ ঘটনায় কোন ছল চাতুরী নাই।

গুরু :—কিন্তু ত্রেতায় এইরূপ নারী-উপভোগের অতৃপ্ত লালসায় সীতা-হরণে লঙ্কাধিপতি রাবণ কতখানি সত্যের উপর পর্দা টেনে দিয়েছিলেন, চিন্তা করিয়া দেখ,—বিশ্বত্রাস শক্তিমান্ রাবণ রাজা স্বীয় বাহুবলেই সম্পন্ন করতে পারতেন, যুগ-প্রভাবে, ছলের আশ্রয় নিয়া তাঁর পাপ উদ্দেশ্যটী ভিক্ষার্থী সন্ন্যাসীর আবরণে ঢাক্‌লেন; ধর্ম্মের ভাণে অধর্ম্ম করলেন। আবার দ্বাপরে দেখ—রাজা দুর্য্যোধন আরও অধিকদূর অগ্রসর হলেন। যতুগৃহ দাহ, বিষ-লাড্ডু প্রদান, দুর্ব্বাসার পারণ—এই সব ধর্ম্মের আবরণে ঢাকা ছলের কথা ছেড়েই দিলাম। যুগপ্রভাবে রাজা দুর্য্যোধন জ্ঞাতিত্বের, ভ্রাতৃত্বের পবিত্র সম্বন্ধটুকু পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়ে অসূর্য্যম্পশ্যা একবস্ত্রা রজস্বলা কুলবধূকে প্রকাশ্য রাজসভায় নিয়ে এসে, সভ্যতার মস্তকে পাদুকাঘাত করে তাঁর অঙ্গবস্ত্র উন্মোচনের আদেশ দিলেন।

শিষ্য :—হাঁ গুরুদেব, এরূপ বর্ব্বরোচিত আচরণ কোন সভ্য-সমাজে প্রকাশ্যসভায় আজ পর্য্যন্ত হ'তে শুনি নাই।

গুরু :—কেবল তাই নয়, ছল পাশায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া ঐ পণ-লব্ধ কুলবধূ নারীর প্রতি ঐরূপ সভ্যসমাজ-বিগর্হিত অশোভন অত্যাচারকে রাজা দুর্য্যোধন ন্যায্য অধিকার বলিয়া দাবী করেছিলেন। আরও শোন,—বয়োবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে ভীমকে স্নেহালিঙ্গন দিতে চেয়েছিলেন, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি ছিল, জান? ভীমকে আলিঙ্গন চাপে বিনষ্ট করা।

শিষ্য :—শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি-কৌশলে ভীম সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন।

গুরু :—বাঁচা মরার প্রশ্ন এখানে উঠ্‌ছে না। অন্তর্নিহিত পাপ উদ্দেশ্যকে কেমন পবিত্র স্নেহের বিতানে ঢেকে কেমন যুগ-মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু সত্যযুগে পিতা পুত্রকে বিষদান করেছিল তাতে ছলমাত্র ছিল না, ধর্ম্মের ভাণে প্রহ্লাদকে ভুলিয়ে বিষ খাওয়ান হয়নি। প্রহ্লাদ জেনে শুনে পিতার আদেশ প্রতি-পালন করে, সেই পিতৃদত্ত বিষ শ্রীভগবানকে অর্পণ করেই ভক্ষণ করেছিলেন।

শিষ্য :—গুরুদেব, কলিযুগ তাহলে বড়ই ভয়াবহ। এ যুগে সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব বলেই মনে হয়।

গুরু :—কতকটা। এ যুগে একপাদ সত্য, আর সবই মিথ্যা। অন্য যুগে দুগ্ধে জল মিশান, কলিকালে জলে মাত্র একটু দুধ মিশান। কে ধাম্মিক, কে অধাম্মিক, কে অর্দ্ধ-ধাম্মিক নির্ব্বাচন করে নেওয়া সমস্যা। জনমত স্বার্থান্বেষী। বিনা বিজ্ঞাপনে ধাম্মিকের সন্ধান পাওয়া যায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনও সংশয়সঙ্কুল। পিতা-পুত্রে সদ্ভাব নাই, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর নিজেকে ধরা দেয় না। প্রায় সর্ব্বত্র একটা অভিনয়। কলি যুগের অন্য নাম, অভিনয় যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শিষ্য :—তা হলে এ যুগের জীব কি উপায়ে সত্যযুগের মনোবৃত্তি লাভ করবে? সকলেই অভিনেতা কে চিনিয়ে দেবে?

গুরু :—না বৎস, সকলেই অভিনেতা নয়, তবে তিনপাদ অর্থাৎ বার আনা আন্দাজ লোক তাই বটে। এ যুগে সত্যযুগের লোকও আছে, একটু পর্দ্দা টানা ত্রেতাযুগের লোকও আছে, আবার অর্দ্ধেকটা পর্দ্দা টানা দ্বাপরের লোকও আছে। আবার বার আনা পর্দ্দা টানা কলিযুগের লোকও আছে। তবে সেই সংখ্যাই বেশী, এইজন্যই ইহার নাম কলিযুগ। তুমি যখনই যে মুহূর্ত্তে, সত্য সত্য,

সত্যকে চিনিতে চাহিবে, তিনি তখনই তোমাকে বুদ্ধিযোগ দিবেন। অল্পবুদ্ধি স্বল্পায়ু জীবের জন্য কলিযুগে তিনি কতই ব্যস্ত—ওগো, তিনি যে দয়াল। এই কলিযুগের প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কত আশ্বাস-বাণী দিয়ে গেছেন। ঐ শোন,—তিনি বল্‌ছেন, 'স্বল্পমপ্যস্ত ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'।

শিষ্য :—ঐ যে বুদ্ধিযোগের কথা বলিলেন, উহার স্বরূপটী কি?

গুরু :—সাধারণতঃ বুদ্ধিযোগ বলিতে এইটুকু বুঝিও—যখন যেখানে যে বুদ্ধিটুকুর প্রয়োজন, তখন সেখানে সেই বুদ্ধিটুকু এগিয়ে দেওয়া। মনে কর, তুমি পরীক্ষা দিতে গিয়াছ, কিম্বা জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছ, তুমি অনেক কথাই জান, যেখানে যে কথাটী বলিলে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, ঠিক সেই সময় সেই কথাটী মনে কিছুতেই উদয় হইল না, অথবা যেখানে যে কথাটী তোমার বলা উচিত নহে, যাহা বহুবার বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ, তাহা বলিয়া ফেলিলে। এখানে বুঝিয়া লও, তোমার বুদ্ধিযোগের অভাব ঘটিয়াছিল। আরও বুঝিয়া লও, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা নয়, তুমি সাফল্য লাভ কর। তাই তিনি ভ্রান্তিরূপে তোমার মধ্যে উদয় হয়ে বুদ্ধিযোগের উপর একটা লম্বা পর্দ্দা ফেলে দিলেন আরও বুঝিয়া লও,—ঐ একটী পর্দ্দা ফেলিয়া তোমার নিরীশ্বরবাদ উদ্ধত পুরুষাকারের উজ্জ্বল বদনখানিকে মসীমলিন করিয়া তুলিলেন। স্মরণ রাখিও বৎস, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া। ইহার অর্থ,—

'প্রাণীসমূহের হৃদে করি অবস্থান,
জেনো পার্থ, চিরদিন নিজে ভগবান্,
যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার মতন,
জীবগণে নিরন্তর করান ভ্রমণ।' গীতা ১৮.৬১

শিষ্য :—এই কলিযুগে অসংখ্য মিথ্যার ভিতর থেকে সত্য উদ্‌ঘাটনে কেমন করে কিভাবে তিনি জীবকে বুদ্ধিযোগ দান করেন।

গুরু :—তুমি একটী চাকরী অনুসন্ধান করিতে যেমন ব্যস্ততা ও আগ্রহ নিয়ে অধ্যবসায়ী হও, সত্য অনুসন্ধানের জন্য ঠিক সেইরূপ হও দেখি। তাঁর এতই দয়া, তোমার মত একান্ত আগ্রহশীল সত্য-প্রার্থীকে ভ্রান্তপথে নিয়ে যাবেন না। তুমি সত্য সত্য যাহা চাহিবে, তিনি তাহাই দিবেন। জ্ঞান চাও, ঐশ্বর্য্য চাও, সুখ শান্তি পদমর্য্যাদা চাও, তিনি সব দেবেন। কিন্তু চাওয়ার মধ্যে খাদ থাকলে সবটুকু পাবে না, যতটুকু খাদ ততটুকু খাদ বাদ দিয়েও পাবে।

শিষ্য :—কেমন করে নিখাদ মন তৈরী হয় গুরুদেব।

গুরু :—সোণা খাঁটি করতে হলে যেমন প্রক্রিয়া আছে, মনকে খাঁটি করতে হলেও তেমনি গুরু-প্রদর্শিত আর্য্যঋষি অনুমোদিত কতকগুলি অনুশীলন আছে। তাঁর পূজায় অনুরাগী হও, তাঁর আরাধনায় অভ্যাসী হও, বিবিধ পূজার উপচারে শ্রদ্ধাশীল হও, একটু ব্যাকুল হও; তিনিই তোমাকে বুদ্ধিযোগ দান করবেন। ঐ শোন, তিনি নিজেই বলছেন—'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। ইহার অর্থ,—

আমার পূজায় যিনি ঢেলে দেন প্রাণ।
আমি তাঁকে বুদ্ধিযোগ করে থাকি দান॥

বৎস, উপাসনা গ্রহণ কর, ধীরে ধীরে অভ্যাসী হও, তোমার সকল সংশয় দুরীভূত হবে। বহুদূরের পথে যেতে হবে, আর বিলম্ব ক'র না।

শিষ্য :—ঐ যে পূজার কথা বলিলেন, উহার স্বরূপটা দয়া করিয়া বলুন।

গুরু :—সাধারণ পূজা সাধন-সোপান প্রথম ভাগে জীবন-গঠনে দেখিয়া লইবে। বিবিধ উপচারের ভিতর দিয়া তাঁকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা, তাঁর জয়গান করা, তাঁর সেবা করা, ইহার নামই পূজা বা অর্চ্চনা। দীর্ঘদিন এই সেবার্চ্চনার দ্বারা সেবকের মধ্যে আস্তিক্য বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিষ্য :—আস্তিক্য বুদ্ধিটা কি গুরুদেব ?

গুরু :—দেখ বৎস, আমরা মুখে শতবার বলি তিনি আছেন, কিন্তু প্রকৃত তিনি যে আছেন, অন্তর থেকে কয়বার এই দৃঢ়বিশ্বাস জেগে উঠে বল দেখি? উঠিতে বসিতে আহারে বিহারে গমনে শয়নে স্বপনে সর্ব্বদা অভ্যাস করতে হবে,—তুমি আছ, তুমি আছ, ঐ পূজার্চ্চনা সেবার দ্বারা। সংযত, মিতবীর্য্য ও একান্ত অনুরক্ত হ'য়ে কিছুকাল ঐ পূজার্চ্চনা চালাতে হয়, ঐরূপ অভ্যাসের ফলে তোমার প্রাত্যহিক কর্ম্মপ্রবাহে যে ছোট বড় তরঙ্গগুলি উঠে নেমে মিলিয়ে যায়, তারাই তোমার প্রাণের কাণে নীরবে বলে দেবে,—'আমি আছি', 'আমি আছি।'

শিষ্য :—আপনার কৃপায় পূজার্চ্চনার উদ্দেশ্যটা বেশ বুঝিলাম। এখন দয়া করিয়া বলুন—কি কি উপচার দিয়া পূজা করতে হয়?

গুরু :—শাস্ত্রীয় নিষিদ্ধ বস্তুগুলি ত্যাগ করিয়া, যার যেটা প্রিয়, সেইটা দিয়া পূজা করিতে হয়। পত্র, পুষ্প, ফল, জল, মিষ্টান্ন, নৈবেদ্য, বসন-ভূষণ, এমন কি, পশু-পক্ষী মৎস্য, মদ্য প্রভৃতি যাহা যাহার প্রিয়, তাহাই তাহার প্রাণের দেবতাকে ভক্তিভাবে নিবেদন করিবে; ঈশ্বর তাই সাদরে গ্রহণ করেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যৎ করোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়,

তৎকুরুষ মদর্পণম্‌॥ ইহার অর্থ—হে কর্ম্মি, হে ভোজনেচ্ছু, হে যাজ্ঞিক, হে তাপস, হে দানশীল, তোমরা যাহাই কিছু কর না কেন, সর্ব্বাগ্রে আমাকে অর্পণ করিবে; অর্থাৎ আমাকে অর্পণ না করিয়া কিছু করিলে, তাহা ব্যর্থই হইবে।

শিষ্য:—ভক্ত-নিবেদিত বস্তু ভগবান গ্রহণ করেন বলেই, ভক্তেরা সেই নিবেদিত বস্তু প্রসাদ বলেই গ্রহণ করেন, নয় গুরুদেব?

গুরু:—হাঁ বৎস, ভগবানকে নিবেদন না করে কোন বস্তুই গ্রহণ করতে নাই। শ্রুতি বলিতেছেন—দেবদয়ং কৃত্বা ভুঞ্জীত। দেবতাকে অর্পণ করিয়া সেই অর্পিত আহার্য্যই প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিবে, নতুবা চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইবে। প্রসাদকে মর্য্যাদা দান করিবে; ইহাই হিন্দু-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। বল দেখি বৎস, হিন্দু-ধর্ম্মের কি গভীর ভাব, ভগবানের নৈকট্যলাভের কি আশাপ্রদ উপদেশ—কি মর্ম্মস্পর্শী অনুশাসন। তুমি যতই ক্ষুধার্ত্ত হও না কেন, পিপাসায় তোমার কণ্ঠ যতই রুদ্ধ হউক না কেন, তুমি হিন্দু, তোমার আহার্য্য, তোমার ঔষধ, তোমার পানীয়, তোমার শয্যা, যাহা মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বিত হলে, হয়ত তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার; কিন্তু উহা গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীভগবানকে নিবেদন করতেই হবে, অন্ততঃ সেই অধৈর্য্য মুহূর্ত্তেও তাঁকে একটীবার স্মরণ করতেই হবে। ঐ শোন—ব্রহ্মদর্শী ঋষি অকুণ্ঠভাষায় বল্‌ছেন—'ঔষধে চিন্তয়েদ্‌ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্‌। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্‌॥' ইত্যাদি। সকল অবস্থায় তাঁকে স্মরণ না কর, তুমি হিন্দুশাস্ত্রমতে রাক্ষস বলে অভিহিত হবে। তুমি তাঁর নিকট চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হবে।

শিষ্য:—আমি আমার কষ্টার্জ্জিত দ্রব্য যদি তাঁকে নাই প্রদান করি, আমি চোর হইব কেন, আমি ত' কাহারও চুরি করি নাই?

গুরু :—ওরে পাগল, ওরে অজ্ঞান শিশু, এই যে ভোগ্যবস্তু হাটে, বাজারে, হোটেলে, দোকানে সহরে, পল্লীতে, ঘরে, বাহিরে তোমার সম্মুখে স্তরে স্তরে সাজান আছে—এর মূল উৎস, তাঁরই ইচ্ছা। জেনে রাখ বৎস, তাঁর করুণাসিক্ত হৃদয়ের ইচ্ছাই ঐ সব ভোগ্যবস্তুর রূপ গ্রহণ করেছে। নতুবা তুমি কুবেরের ভাণ্ডারের বিনিময়েও এতটুকু পানীয়, একদানা আহার্য্য পেতে না। ঐ শোন তিনি তোমার অজ্ঞতা দূর করবার জন্য বল্‌ছেন—'বীজং মাং সর্ব্ব-ভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং।' বৎস, আকাশরূপে তিনি, জলরূপে বায়ুরূপে, তেজরূপে, মৃত্তিকারূপে তিনি, এ সব কথা বিশদভাবেই পঞ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যায় বলেছি, এর মধ্যে ভুলিলে চলিবে কেন? বল দেখি, তাঁকে বাদ দিলে তোমার ভোগ্যবস্তু থাকে কোথায়?

শিষ্য :—আপনি যে বলিলেন, প্রসাদকে মর্য্যাদা দিতে হবে, উহার স্বরূপ কি?

গুরু :—পূর্ব্বেই বলেছি—বিধিমতে যদি কোন বস্তু তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তাহাই প্রসাদ জানিবে। আর প্রসাদ হলেই মর্য্যাদা দিতেই হবে। কুকুর যদি প্রসাদে মুখ দেয়, প্রসাদ অপবিত্র হয় না, বরং কুকুরের মুখ পবিত্র হয়ে যায়। এই বোধ লইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই প্রসাদের প্রকৃত মর্য্যাদা দান। তবে বিচার্য্য—তুমি সাত্ত্বিক, তুমি যদি সর্ব্বভুক্ না হও, তোমার নিষিদ্ধ বস্তু যদি কোন রাজসিক বা তামসিক ভক্ত তাঁর দেবতাকে নিবেদন করে তোমাকে প্রসাদরূপে দিতে আসেন, তুমি গ্রহণ করিবে না, তাতে প্রসাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হবে না। কারণ তুমি সাত্ত্বিক, তোমার পূজা ভোগ রাগ চন্দন বন্দন, সবই সাত্ত্বিক, তুমি যাহা খাও না, তোমার সেই ভক্তবৎসল ভগবানও তাহা খান না। কাজেই তোমার পক্ষে যাহা অনিবেদ্য, তাহাই তোমার পক্ষে অখাদ্য।

শিষ্য :—তাহলে দেখ্‌ছি, অধিকারীভেদে পূজাও তিন প্রকার, উপচারের ভেদও তিন প্রকার।

গুরু :—হাঁ বৎস, অধিকারীভেদে পূজাও তিন প্রকার, আবার আবার পূজাভেদে উপচারও তিন প্রকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে লিখিত আছে—সাত্বিকী রাজসী চৈব ত্রিধা পূজা চ তামসী। ভগবত্যাশ্চ বেদোক্তা চোত্তমামধ্যমাধমা॥ ৬৪।৪৫। যিনি সাত্বিক পূজারী, তিনি সাত্বিক দ্রব্যসম্ভারে সত্বগুণোৎপাদক উপচারে সাত্বিক পদ্ধতিতে পূজা করিবেন। এই পূজাই উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁর প্রকৃতি রাজসিক, তিনি রাজসিক দ্রব্যসম্ভারে রজোগুণোৎপাদক উপচারে রাজসিক পদ্ধতিতে পূজা করিবেন—এই পূজা মধ্যমপূজা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আর তমোগুণপ্রধান যাঁরা, তাঁরা তামসিক দ্রব্যসম্ভারে তমোগুণোৎপাদক উপচারে তামসিক পদ্ধতিতেই পূজা করিয়া থাকেন। এই তামসিক পূজা অধম পূজা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শিষ্য :—ঐ তিন প্রকার পূজাই ত' তিনি গ্রহণ করেন গুরুদেব?

গুরু :—বিস্তৃতভাবে এত উপদেশ শুনেও এখনও সন্দেহ কেন? বৎস, তিনি বিশ্বমূর্ত্তিতে সকল পূজাই গ্রহণ করেন। ঐ শোন—তিনি অভয় দিয়া বল্‌ছেন—যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং। ইহার অর্থ,—যে সকল সকাম ব্যক্তি ভক্তিভাবে যে যে দেবমূর্ত্তির পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি অন্তর্যামিরূপে সেই সকল ভক্তের সেই সেই দেবমূর্ত্তিতে ভক্তি অচলা করিয়া দিয়ে থাকি। গীতা ৭।২১। এখানে কেবল সাত্বিক ব্যক্তির পূজা ভগবান গ্রহণ করেন, আর কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না, এমন কথা বলেন নাই। সকলেরই পূজা গ্রহণ করেন, অধিকারীর

যূপে বন্ধন করিবে। দেবী-ভাগবতে লিখিত আছে,—মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুঘাতনং। মহিষাজবরাহানাম্ বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ইহার অর্থ,—যাঁহারা মাংস ভক্ষণ করিবেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই পশুহত্যা করিতে হইবে। মহিষ, ছাগল ও বরাহ প্রভৃতি পশুগুলিই বলিদানের পক্ষে বিশেষ যোগ্য। কালিকাপুরাণে ৬৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে—'বলিদানেন সততং জয়েচ্ছত্রূন্ নৃপান্ নৃপঃ। ইহার অর্থ—রাজা সর্ব্বদাই বলিদানের দ্বারা দেবীকে প্রীত করিয়া শত্রুজয় করিবে। সমাজসংগঠনকারী, ত্রিকালদর্শী মহর্ষি মনু তাঁর সংহিতা শাস্ত্রে বিধি দিয়াছেন—যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। যজ্ঞোহস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ। ইহার অর্থ—জগতের পুষ্টিকারক যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের সমাধানের জন্য স্বয়ং প্রজাপতি পশুগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং জগতের পুষ্টিসাধক যজ্ঞের জন্য যে পশুবধ, উহা সাধারণহত্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। মনু-সংহিতা ৫।৩৯। মহর্ষি মনু আরও বলিয়াছেন—মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি। অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥ ইহার অর্থ—মধুপর্কে যজ্ঞে পিতৃকার্য্যে ও দেবতাদিগের প্রীত্যর্থ পশুহত্যা করিতে পারা যায়। অন্য কোন কার্য্যে পশুহত্যা করা উচিত নহে।

শিষ্য:—মধুপর্ক কাহাকে বলা হয় গুরুদেব?

গুরু:—বর্ত্তমান কালে যেমন বাড়ীতে কোন বিশিষ্ট অতিথি আসিলে, তাঁকে চা, জলখাবার দিয়া আপ্যায়িত করা হয়, পুরাকালে কোন বিশিষ্ট অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে, পুষ্টিবর্দ্ধক ঘৃত, মধু, দধি ও পশুমাংসের মিশ্রণে একপ্রকার খাদ্য প্রদান করা হ'ত। উহাই মধুপর্ক নামে কথিত। বর্ত্তমান কলিযুগে দুর্ব্বল যকৃৎ ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা ভক্ষণ করা নিষ্ফলা বলিয়া দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারকে লক্ষ্য

করিয়া মধুপর্কে পশুবধ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় কলিযুগে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

শিষ্য :—গুরুদেব, সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা যে পশু বলিদান দিবেন না, এরূপ কোন নিষেধ আছে ?

গুরু :—আছে বৈকি বৎস। শব্দকল্পদ্রুমধৃতপাদ্মোত্তর-খণ্ডে দেবী ভগবতীর উক্তিতে স্পষ্টই লিখিত আছে—পশুহিংসা বিধির্যত্র পুরাণে নিগমে তথা। উক্তো রজস্তমোভাজাং ন কেবলং তমস্বিনাম্ ॥ ১০৪,৫ অঃ। ইহার অর্থ—পুরাণাদিতে যে যে স্থলে পশুহিংসার বিধি আছে, রজস্তমোগুণান্বিত ব্যক্তির পক্ষে অথবা কেবল তামসিক ব্যক্তির পক্ষেই ঐ বিধি বুঝিয়া লইবে। সুতরাং যাঁরা সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন জীব, তাঁরা কদাচ পশু বলিদান করিবেন না।

শিষ্য :—সাত্ত্বিক পূজায় কি তাহলে বলিদান নিষিদ্ধ হয়েছে ?

গুরু :—না, বৎস। কোন বিশেষ পূজা করতে হলেই বলিদান ও হোম করতেই হয়। তারা-প্রদীপে দ্বিতীয় পটলে সাত্ত্বিক পূজা লক্ষ্য করিয়া লিখিত আছে,—সাধকো জীবহত্যাঞ্চ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ। ইক্ষুদণ্ডঞ্চ কুষ্মাণ্ডং তথা রম্যফলানি চ। পিষ্টক্ষীরৈঃ শালিচূর্ণৈঃ পশুং কৃত্বা দদেৎ বলিং।

শিষ্য :—বিনা পশু বলিদানে কালীপূজা বা যে কোন শক্তিপূজা হতে পারে ?

গুরু :—সাত্ত্বিকমতে যিনি কালীপূজা বা শক্তিপূজা করতে চান, তিনি পশু বলিদান ও মদ্যাদি দান না দিয়াই করিবেন। বাজারের মাংস খাবেন, আর কালীপূজার সময় সাত্ত্বিকভাবে পূজা করছি বলে বলিদান এড়িয়ে চলবেন, ইহা হতে পারে না। যিনি মাংসাদি মোটেই খান না, তিনিই সাত্ত্বিক পূজার অধিকার পেতে পারেন, রাজসিক পূজায় তাঁর অধিকার নাই। কারণ রাজসিক

কর বলেই, মৎস্যজীবীরা দিবারাত্র মৎস্যের জীবন-নাশ করছে, পশু-ঘাতকেরা সোৎসাহে নিষ্ঠুর হস্তে নিরপরাধ পশুর জীবননাশ করছে তোমারই জন্য। তোমার ঐ অনুগত সেবক ব্যবসায়ীরা ঐ সব মৎস্য, মাংস স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখে, সোৎসুকনয়নে তোমারই আগমন-পথ চেয়ে আছে। বৎস, তুমি মহাপাপ প্রতিদিনই অর্জ্জন করছ। ঐ শোন মহর্ষি মনু—যাঁর মতবাদের সঙ্গে অন্যান্য স্মৃতি-শাস্ত্রের অমিল হলে অগ্রাহ্য হয়, সেই ত্রিকালদর্শী ঋষি বলিদান ব্যতীত মাংস ভক্ষণে কি দোষ হয় বলছেন শোন,—অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥ ইহার অর্থ - বলিদান ব্যতীত পশুহত্যার অনুমোদনকারী, মাংস কর্ত্তনকারী, পশুহত্যাকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা উহার পাচক, পরিবেশন-কর্ত্তা ও উহার ভোক্তা সকলেই ঘাতক পদবাচ্য। অর্থাৎ পশু-হিংসাকারী ঘাতকের যে পাপ হয়, ঐ সকল ব্যক্তিদেরও সেই পাপ হয়। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বেও ঠিক ঐ কথাই উক্ত হয়েছে,—আহর্ত্তা চানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়-বিক্রয়ী। সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ ঘাতকাঃ সর্ব্ব এব তে॥ বৎস, তুমি দুর্ব্বলচিত্তে দেবতার সম্মুখে পশু-হত্যার বীভৎস দৃশ্য দেখতে পারছ না, একটু লাল রক্ত দেখলে তোমার মাথা গরম হয়ে উঠছে, তুমি ঋষিবাক্য লঙ্ঘন করে বলিদানের বিরুদ্ধবাদী হচ্ছ, কিন্তু দিবারাত্র বৃথামাংস ভক্ষণ করিয়া তোমার পাপের পসরা ভারাক্রান্ত হচ্ছে,—কাজেই আরও দুর্ব্বল-চিত্ত হ'চ্ছ। তোমার মদ্য মাংস ভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যদি ঘটে থাকে, অথবা মদ্য-মাংস-ভক্ষণের দুর্দ্দমনীয় তীব্র লালসা যদি তোমার মধ্যে জেগে থাকে, সকল-সময়-বিবেচক হিন্দুশাস্ত্র তোমাকে ঐ সব ভক্ষণে নিষেধ করেন নি, তোমার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে হঠাৎ একদিনেই সংযত করতে বলেন নি। ঐ শোন, মহাপ্রাণ মহর্ষি মনু বলছেন—'ন মাংস ভক্ষণে দোষো'। কিন্তু বৎস, 'দেবদেবেভ্যঃ কৃত্বা

ভুক্তীভ'। ঋষিবাক্যে অনুরাগী হ'য়ো বৎস, নতুবা পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য্য। মাংসাদি যদি খেতেই হয়, সুলক্ষণ পশু দেবতাকে নিবেদন করে বলিদান দিয়ে খেতে হবে। নতুবা হিন্দুশাস্ত্রমতে মহাপাপভাগী হবে।

শিষ্য :—কিন্তু জগন্মাতার সম্মুখে তাঁর সন্তানের প্রাণবধ করা, এ কি জগন্মাতা চান, না, ইহা করা আমাদের উচিত? ইহা কি আমাদের বিবেকে আঘাত লাগে না?

গুরু :—ঠিক কথা। বৎস, তিনি কেবলমাত্র জগজ্জননী নন, তিনি জগৎপালিনী জগৎসংহারিণী। সর্ব্বদাই তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংসরূপে জগন্মূর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত, এ সব বড় বড় কথা বহু পূর্ব্বেই বলেছি। তিনি জগন্মাতা, এই বোধ অভিনেতার মত কেবলমাত্র মুখে না ফুটাইয়া সত্য সত্য প্রাণের ভিতর যেদিন ফুটিয়া উঠিবে, সেই দিন তুমি নিবৃত্তিমার্গের সাত্ত্বিক জীবন লাভ করিয়া মহাভাগ্যবান্ ও ধন্য হইবে। তখন জগতের জীবজন্তু কীট-পতঙ্গ সকলের উপরই তোমার ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হবে। তখন মাত্র দুর্ব্বলনয়নের বীভৎস দৃশ্য ও ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলবার জন্য বলিদানের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করতে মিছামিছি দেবীকে শব্দগত জগন্মাতা বলিয়া তর্কযুক্তির অবতারণা করিবে না। মাংস ভক্ষণের তীব্র লালসা মনের মধ্যে রেখে, পশু-পক্ষী সবই 'জগজ্জননীর সন্তান' এই কথা মুখে মাত্র উচ্চারণ করিলে বৃথা দরদ দেখান হয়।

শিষ্য :—কেন গুরুদেব, বৃথা দরদ দেখান হয়?

গুরু :—ওগো, বৎস, ওসব মৌখিক দরদ বল—পশু-পক্ষী, মৎস্য, যদি সত্যই জগজ্জননীর সন্তান হয়, এই সত্যবোধ যদি সত্যই তোমার মধ্যে জাগ্রত হয়, তাহলে উহারা ত' আমাদের সম্পর্কে ভাই হয়। বিরাট জননী-উদরে আমরা লক্ষ্য লক্ষ্য জীব সকলেই উদ্ভূত, উহারা সে হিসাবে আমাদের সহোদর। এই বোধ ভণ্ডামীশূন্য

হলেই তখন আর কসাইখানা থেকে টাট্‌কা ভ্রাতৃমাংস খরিদ করে এনে খাইবার প্রবৃত্তি থাক্‌বে না। তখন মৎস্যগুলির প্রতিও জগজ্জননীর সন্তান হিসাবে তোমার ভ্রাতৃ-প্রেম সত্যই উদ্বুদ্ধ হবে।

শিষ্য :—আর যদি কোন মহাপ্রাণ সাত্ত্বিক ব্যক্তি, যিনি মৎস্য, মাংস কদাচ স্পর্শ করেন না, দেবতার সম্মুখে পশু-হত্যার বিরুদ্ধে যদি কিছু বলেন, আপনি কি বল্‌বেন ?

গুরু :—আমি সেই নিরামিষাশী মহাপ্রাণ সাত্ত্বিক ব্যক্তিকে বলিব—ওগো অগ্রগামী সাত্ত্বিক সাধক, পূর্ব্বজন্মে বহু মাংস খেয়েছেন, ক্রমবিকাশে রজোগুণ হইতে বর্ত্তমানে সত্ত্বগুণে উন্নত হয়েছেন, এখন এই পশ্চাদ্‌গামী রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তির ধর্ম্মে কেন বাধা দিচ্ছেন। আপনি জ্ঞানী, জানেন ত'—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌'।

শিষ্য :—ঐ সব দার্শনিক যুক্তি যদি তিনি না শোনেন, তখন কি বল্‌বেন ?

গুরু :—রূঢ়কথা বলা হবে না, বৎস। এইমাত্র বলিব,—"মহাশয় আপনি যত বড়ই সাত্ত্বিক তাত্ত্বিক হউন, আমার ঋষি-সঙ্ঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অতিথি মহর্ষি মনুর উপরে কথা বলিবার অধিকার আপনার এখনও হয় নাই। সেই অটুট ব্রহ্মচর্য্য-নিরুদ্ধ-বুদ্ধিবৃত্তিও আপনার নাই। আপনি দয়া করে সরে পড়ুন।

শিষ্য :—আপনি যা বলিলেন, সবই সত্য। ঋষির মহৎপ্রাণের সাধু উদ্দেশ্য সব সময় আমরা মোটাবুদ্ধির লোক বুঝতে পারি না। আচ্ছা গুরুদেব, এই নিরীহ পশু-বলিদানের ব্যবস্থা দিতে ঋষির প্রাণ কি আমাদের মত একটুও কেঁদে উঠেনি।

গুরু :—বৎস, ব্রহ্মদর্শী ঋষি সর্ব্বদাই জীবন্মুক্ত ; তাঁদের মধ্যে হাসি-কান্না নাই। সমাজের প্রত্যেক ছোট বড় জীবের কল্যাণ

কামনাই তাঁদের ব্রত ছিল চিন্তা করিয়া দেখ বৎস, সমাজ-হিতৈষী মহাপ্রাণ ঋষি পশু-বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া সমাজের কত উপকার সাধন করিয়াছেন। দু-চারটী সাত্ত্বিক জীবের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ জীবই অসংযত উচ্ছৃঙ্খল, সুতরাং ধ্বংসশীল। সংযম ব্যতীত শান্তি পাইবার উপায় নাই। আবার নিয়মানুবর্ত্তিতা ব্যতীত সংযম আসে না কাজেই মাংসলোভী প্রবৃত্তিমার্গের অসংযত জীবগণকে ধীরে ধীরে নিবৃত্তিমার্গে শান্তির কোলে টেনে আনতে হলে, মাংস ভক্ষণ করিও না বলিলে কেহই হঠাৎ ঐরূপ প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিত না। তাই বিধিবোধিত ঈশ্বরমুখী ধর্ম্মানুশীলনের ভিতর দিয়া পশু-বলিদানের ব্যবস্থা। আর্য্য ঋষিগণের মত পশুর প্রতি এত দরদী আর কেহ সভ্য-সমাজে জন্মেছেন, ইতিহাস খুলে দেখাতে পার, বৎস! উচ্ছৃঙ্খল জীবগণের দ্বারা প্রত্যহ দিবারাত্র যেখানে সেখানে লক্ষ লক্ষ পশুর প্রাণবিয়োগ হচ্ছিল। তাহাতে কত রুগ্ন, জীর্ণ, ক্ষতবিশিষ্ট স্ত্রীপুংস নির্ব্বিশেষে অমেধ্য পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়া অসংযত সমাজ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন লালসাগ্নির দাবদাহে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছিল। সেদিন বৈদিক ঋষির তাপস প্রাণ সমাজ-কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আর সেই বেদের ঋষি অপৌরুষেয় শ্রুতিতে উচ্চকণ্ঠে গা'হলেন—'সুলক্ষণপশুমানীয় যূপে বধ্নীয়াৎ', 'দেবদেয়ং কৃত্বা ভুঞ্জীত'; বল দেখি বৎস, যেদিন এই হিন্দু-সমাজ আনতমস্তকে ঋষির ঐ মঙ্গলাস্পদ অনুশাসন মানিয়া লইল, সেদিন কসাইখানার সহজপ্রাপ্য লক্ষ লক্ষ পশুর প্রাণ বেঁচে গেল কিনা? সুলক্ষণ সবল নীরোগ পশু অন্বেষণে কালক্ষেপ হতে লাগল কিনা? অসংযত লালসাগ্নি ক্ষণকালের জন্য স্তিমিত হল কিনা? ঈশ্বরবিমুখ উচ্ছৃঙ্খল জীব, ঈশ্বরের দিকে মাংসলোভী হইয়াই মুখ ফিরাইল কিনা? বৎস, ঐ দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংযম ক্রমবিকাশে এক বিরাট

আকার ধারণ করিয়া থাকে। হঠাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান কেহ লাভ করে না, ধীরে ধীরে তাহার বিকাশ হয়। আজ যাঁরা ঘোর মাংস-লোভী, বলিদানের আবহাওয়ায় যদি আসতে পারেন, ধীরে ধীরে তাঁরাই একদিন সাত্ত্বিকত্ব, মহাপুরুষত্ব লাভ করে শান্তির স্নিগ্ধ ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভের সুযোগ পাবেন। ঋষি আত্মসম্বেদনের দ্বারা জেনেছেন—দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিয়া পূজা করিলে দেবতা প্রীত হন, ঐভাবে উৎসৃষ্ট পশুমাংস ভক্ষণে কোন পাপ নাই, কোন রোগ নাই, কোন অনুশোচনা নাই, তাই মুক্তকণ্ঠে পশু ও মানবগণের কল্যাণেই ঐ বলিদান প্রচার করে গেছেন। স্থূল যুক্তিতে ঋষিবাক্য অমান্য করিও না। যাহা কিছু খাইবে, বৎস, ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া খাও। ঝঞ্ঝাট এড়াতে গিয়ে নিজেকে অল্পায়ু ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলো না।

শিষ্য :—গুরুদেব, আপনার অশেষ কৃপায় আমার সকল সংশয় দূরীভূত হইল। এ বিষয়ে কেবল আর একটী প্রশ্ন, দয়া করে বলুন—নিরীহ জীবের প্রতি মানবের কি অধিকার আছে যে তাঁরা ইচ্ছামত ক্ষুদ্র অসমর্থ জীবগুলিকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন ?

গুরু :—হাঁ বৎস, আমি সন্তুষ্টচিত্তে এ প্রশ্নের সমাধান করে দিচ্ছি। একবার সৃষ্টি-তত্ত্বের মূলনীতিতে লক্ষ্য কর, সহজে সমাধান করতে পারবে। জীবাণু না খেলে কোন জীবই একমুহূর্ত্ত বাঁচে না। প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয়। চিৎশক্তির দ্বারা চিৎশক্তি পুষ্টিলাভ করে। ইহাই পালন-তত্ত্বের চিরন্তনী নীতি। এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই ছোট, বড়, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, অত্যতিসূক্ষ্ম কোটী কোটী জীবাণু আছে। জল, বাতাস, পত্র, পুষ্প, ফলমূল, শাকসব্জী, জীবজন্তু প্রত্যেকটী জীবাণুতে পরিব্যাপ্ত। যেখানে রস, যেখানে শৈত্য, সেইখানেই জীবাণু

পরিপূর্ণ। সুতরাং তুমি শ্বাস-প্রশ্বাসে বায়ুর সঙ্গে অগণিত জীবাণু গ্রহণ করছ, যা কিছু খাইতেছ, জীবাণু গ্রহণ করিতেছ, তোমার চলাফেরা উঠা বসায় অগণিত জীবাণু ধ্বংস হচ্ছে।

শিষ্য :—মহাপ্রাণ সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণও কি এই জীবাণু ভক্ষণ করেন ?

গুরু :—হাঁ বৎস, তাঁরা স্থূলতঃ জীব ভক্ষণ করেন না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে অগণিত জীবাণু ভক্ষণ করেন, ধ্বংস করেন। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, এই নিয়েই সংসার ; গড়ে তোলা, ধরে রাখা, ভেঙ্গে ফেলা এই তিনটী একসঙ্গেই চল্‌তে থাকে, প্রথমেই এ সব ব্যাখ্যা শুনিয়ে এসেছি। এমন জীব এ জগতে নাই, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার এই তিনটাকে বাদ দিয়ে ক্ষণকাল বাঁচতে পারেন।

শিষ্য :—হাঁ গুরুদেব, স্মরণ হয়েছে—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, একটীকে বাদ দিয়ে আর একটী দাঁড়াতে পারে না।

গুরু :—হাঁ বৎস, তেমনি জীবাণুকে ধ্বংস না করে জীব বাঁচতে পারে না। নিবৃত্তিমার্গের জীব শুষ্ক পত্র, যাতে অতি অল্প জীবাণু, তাই ভক্ষণ করেও জীবনধারণ করেন—ইহাও দেখা গেছে। অপরিহার্য্য ও অলঙ্ঘনীয় কারণে যেখানে যেটুকু জীবাণু ধ্বংস না করলে চলে না, সেইটুকু মাত্র করিয়া সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। প্রবৃত্তিমার্গের জীব তাঁরা সূক্ষ্ম জীবাণু ত' ধ্বংস করেনই, তা ছাড়া স্থূল জীবগুলিকেও ধ্বংস করেন। দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয় রণকৌশল শিক্ষায় অভ্যাসের ক্রমে বনে স্বচ্ছন্দবিচরণশীল নিরীহ পশুগুলিকে হত্যা করিয়া উহাকে ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম্ম মৃগয়া আখ্যা দিয়াছেন। আবার ঐ বন্য পশুগুলি বনের অতি নিরীহ ছোট ছোট জীবগুলিকে ভক্ষণ করিয়া মাংসভোজী জীব আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে। আবার কেহ বা পশুরাজও হইয়াছেন। আবার ঐ ছোট ছোট

জীবগুলি, উহা অপেক্ষা আরও অতি ছোট ছোট জীবগুলিকে ভক্ষণ করিয়া দেহধারণ করছে। সুসভ্যমনুষ্য-সমাজও স্বকীয় পুষ্টিসাধনের জন্য অগণিত জীবের প্রাণনাশ করছে। আবার যাঁরা শক্তিশালী, তাঁরা দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া অগণিত দুর্ব্বল নরগণের প্রাণনাশ করছেন ইহাই আবার ন্যায্য অধিকার বলিয়া সভ্য-সমাজ দাবী করছেন।

শিষ্য :—সত্যই ত গুরুদেব, দুর্ব্বলের উপর পর পর বলবানের অধিকার অবাধ গতিতেই ছুটেছে।

গুরু :—হাঁ বৎস, ক্ষুদ্রের উপর বলবানের অধিকার অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, এ অধিকারচ্যুত হ'লে জীবজগৎ একমুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সত্যদর্শী ঋষি এই সত্য উপলব্ধি করিয়া মানব-সমাজকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যিনি তামসিক জীব, তাঁকে রাজসিকভাবে উন্নীত করিবার বিধি দিয়াছেন, যিনি রাজসিক তাঁকে সাত্ত্বিকভাবে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু, দৈন্য-দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনা মানবের জীবনকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। ঐ সব দুঃখবাদই দার্শনিক চিন্তার কারণ হইল। একমাত্র ঈশ্বর উপাসনা ব্যতীত ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবের উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই। আর্য্য-ঋষিগণ কঠোর তপস্যায় আত্মসম্বেদনে এই সত্য উপলব্ধি করিলেন। তাই দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের অনুশীলনে অসংযত উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরমুখী করিয়া দুঃখবাদের অবসান ঘটাইয়া শান্তির বা মুক্তির প্রশান্ত ক্রোড়ে টানিয়া আনিলেন। বৎস, তোমরা সেই অমৃতের পুত্র, অমৃত-ঋষি চরণে প্রণত হয়ে সেই অমর হিন্দুশাস্ত্রের অনুসরণ কর; তোমরা হিন্দুসন্তান, হিন্দু-ধর্ম্মের গূঢ়-রহস্য অবগত হও। দুধর্ম্ম যে বিশ্বের সনাতন ধর্ম্ম, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সে যে জনক,

চির-অধ্যায়ী, তাহা মুখস্থ করিয়া শেখা যায় না, কয়েকটী বক্তৃতা শুনিয়াই তার কিছুই উপলব্ধি হয় না, তা একমাত্র সাধনার দ্বারা অনুভাব্য। তাই বলছি—মহাপ্রলয় হুঙ্কার ছাড়ছে, সে ক্ষণেক থামলেও আবার দ্বিগুণ তেজে অদূরভবিষ্যতে গর্জ্জে উঠবে। যদি অমৃতের পুত্র হতে চাও, যদি বাঁচতে চাও, হিন্দুশাস্ত্রে অনুরাগী হও, যথার্থ হিন্দু হও, হিন্দুর মহিমা জগতে প্রচার কর। হিন্দুশাস্ত্রের অমৃতপীযূষ তাপদগ্ধ জগদ্বাসীকে পান করাইয়া অমর করিয়া তোল। জয় শ্রীগুরুঃ।

জীবন্মুক্তি

শিষ্য :—আপনি যে এইমাত্র বলিলেন,—আর্য্যঋষিগণ তাপদগ্ধ জীবগণকে ঈশ্বরমুখী করিয়া দুঃখবাদের অবসান ঘটাইয়া শান্তি বা মুক্তির প্রশান্ত ক্রোড়ে টানিয়া আনেন, ঐ শান্তি বা মুক্তি কি একই জিনিষ?

গুরু :—হাঁ বৎস, মোটামুটি ঐ দুইটা একই বস্তু। চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা, এক কথায় কর্ত্তৃত্ববোধের বিলাস,—এইগুলি দুঃখদায়ক, এইগুলি জীবজগৎকে নিরন্তর অশান্ত করে তোলে। এইগুলির শমতার নামই শান্তি। আবার এইগুলিই মুক্তির বিরোধী। অর্থাৎ এককর্ত্তৃত্ববোধের অভাবই বন্ধন।

শিষ্য :—প্রকৃত মুক্ত শব্দের অর্থ কি গুরুদেব?

গুরু :—মুচ্ ধাতু থেকে মুক্তি শব্দটী তৈরী হয়েছে। মুচ্ ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করা। যাকে বলে, খোলসা হওয়া; বন্ধনের বোধ না থাকা। বন্ধনের বোধ যখন তীব্র হয়, তখনই তা হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তীব্র হয়ে উঠে।

শিষ্য :—তাহলে গুরুদেব, চাঞ্চল্যের মধ্যেও যিনি আনন্দ পাচ্ছেন, কর্ত্তৃত্বের বিলাসে যিনি উচ্ছ্বসিত, ঐগুলিকে যিনি বন্ধন মনেই করেন না, তাঁর সম্বন্ধে মুক্তির কোন কথাই উঠতে পারে না ; তাঁকে মুক্ত হবার উপদেশ দিয়ে লাভ কি ?

গুরু :—আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, অজ্ঞান শিশুর এ বোধ নাই, বরং আগুন নিয়ে খেলা করতে পেলে তার আনন্দই হয়, তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলে শিশুটী চীৎকার করেই উঠে। এক্ষেত্রে হিতৈষী পিতামাতা শিশুটীকে যেমন আগুনে হাত দিতে নিবৃত্ত করেন, সেইরূপ অখিল হিতকামী আর্য্য-ঋষিগণ জীবের বন্ধন বোধ জাগিয়ে দিয়ে মুক্তির সন্ধান বলে দিয়েছেন। ইহা ঋষিগণের কৃপা। অবশ্য ইহার জন্য হিন্দুসন্তানগণ কৃতজ্ঞতায় আনত-মস্তকে অদ্যাবধি প্রত্যহ সেই ঋষি-চরণের তর্পণ করিয়া আসিতেছেন, পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম ঋষিযজ্ঞের বা ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। (ঋষিযজ্ঞ—সাধন সোপান প্রথম ভাগ ৯৮ পৃষ্ঠা) তোমার সম্মুখে বিপদের কাল মেঘ ঘনায়িত, তুমি অন্ধ, তোমাকে যদি কৃপা করে কেহ সতর্ক করে দেন, বল দেখি—তিনি কত বড় মহাপ্রাণ হিতৈষী বন্ধু ?

শিষ্য :—হাঁ গুরুদেব, ঐরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত মহাত্মা, স্বভাব-হিতৈষী। হেসে খেলে সংসার চল্‌ছে, তেমন তীব্র শোক দুঃখ নাই, তেমন নিদারুণ অভাব-দৈন্যে দিশেহারা হতে হচ্ছে না, তেমন অসহনীয় একটাও ধাক্কা খেতে হয়নি, স্থির-সমুদ্রে অনাক্রান্ত জাহাজ গর্ব্বভরে পতাকা উড়িয়ে যেমন চলে, সেইরূপ দুর্ব্বারগতিতে যে পথিক লক্ষ্যহীন হয়ে ছুটেছে, তাকে সে সময় সাবধানতার কথা বলিলেই সে বিরক্ত হয়ে উঠিবে, হয়ত বা বিরোধিতা করিবে ; কিন্তু ঋষি-চরিত্রে কোথাও ভয় নাই, দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ

নাই, তাই নির্ভয়ে তাঁরা কথা বল্‌তে পেরেছিলেন, নয় গুরুদেব ?

গুরু :—হাঁ বৎস, যাঁরা ব্রহ্মসাধনায় অভ্যস্ত, তাঁরা সত্যদর্শনের সুযোগ পান, যাঁরা সত্যের দর্শন পান বা একটু ছোঁয়াচ পান, তাঁদের মধ্যে ভয়, দ্বিধা বা সঙ্কোচ থাকে না। ঐ যে বলিলে—পথিক দুর্ব্বার গতিতে ছুটেছে, ঐ পথিক জানে না,—অদূর ভবিষ্যতে সে তার তথাকথিত স্থির সমুদ্রের চোরা পাহাড়ের ঘা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ ছন্নছাড়া হয়ে এলিয়ে পড়বে। তাই দয়াল ঋষিগণ সাধনায় আত্ম-সম্বেদন লাভ করিয়া পথিককে চলবার পথের সন্ধান বলে দিয়েছেন। বিপদসঙ্কুল পথগুলিকে রেখাঙ্কিত করে সে পথে চলাফেরা করতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছেন। আজ যদি পাশ্চাত্যভাবমদিরায় পথিক সংজ্ঞাশূন্য হয়ে রেখাঙ্কিত নিষিদ্ধ পথগুলিতেই হাঁট্‌তে আরম্ভ করেন, তখন আমি বলিব,—ইহা হতভাগ্য হিন্দুসন্তানগণের নির্মম অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। বৎস, তুমি যে এইমাত্র বলিলে, উহাদের বন্ধন-বোধ নাই—এ কথা সত্য নহে। ঐ সব পথিকের বন্ধনবোধ খুবই আছে। কিন্তু সে বন্ধনবোধটুকু এখন সাময়িক নিদ্রিত, একটা ধাক্কা খেলেই সে বন্ধনবোধ লাফ দিয়ে জেগে উঠ্‌বে, তখন তীব্র যাতনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করবে।

শিষ্য :—তখন কি রেখাঙ্কিত নির্দ্দিষ্ট নিষিদ্ধ পথগুলি সে পথিক পরিহার করবে ?

গুরু :—সাময়িক সে নিশ্চয়ই করিবে। কিন্তু অভ্যস্ত পথ থেকে ফেরা বড় কঠিন কথা। পুনরায় সে বিপন্মুক্ত হলেই তার অভ্যস্ত পথে ফিরে যাবে। এইরূপ দীর্ঘকাল যাওয়া আসা করতে করতে যেদিন প্রকৃত মুক্তিপথের সন্ধান পাবে, সেদিন রেখাঙ্কিত নিষিদ্ধ পথে ফিরে না গিয়ে হিন্দুসন্তানের চিরপরিচিত পথেই চল্‌তে থাকবে।

শিষ্য :—হিন্দুর চিরপরিচিত পথ এখানে কোনটীকে লক্ষ্য করছেন গুরুদেব ?

গুরু :—হিন্দুর একটীই চিরপরিচিত পথ। রুচিভেদে অধিকারী-ভেদে প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণে বহু সঙ্কীর্ণ পথ থাকিলেও লক্ষীভূত প্রাণারাম শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হতে হলে, মুক্তগগনচুম্বী বিশ্বনাথের মন্দির-চূড়া দর্শন করতে হলে, সেই এক চিরপরিচিত পথ দিয়েই যেতে হবে। সে পথটী হচ্ছে—বহুবার বলেছি, আবার বলছি শোন,—যোগস্থ: কুরুকর্ম্মাণি। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। ঐরূপ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হবে না, অশান্তির উৎপাদক হবে না। তাঁকে আত্মীয় করে লও, পরম আত্মীয়বোধে বিশ্বেশ্বরের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লও, ভক্ত হও, উপাসনা আরম্ভ করে দাও। যতক্ষণ তাঁর বিরাট কর্ত্তৃত্বে নিজ ক্ষুদ্র কর্ত্তৃত্বটুকু দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মিলাইয়া লইতে না পারিতেছ, ততক্ষণ শান্তি বা মুক্তির কোন সন্ধান পাবে না যেদিন শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় সত্য সত্য বলিতে পারিবে—'ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্ম্মহেতুস্বরূপা, ত্বংবুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থা', সেদিন অর্জ্জুনের মত তুমিও পাপ-পুণ্যের অতীত হবে, দুঃখ-দৈন্য শোকতাপকে পদদলিত করে জীবন্মুক্তির সন্ধান পাবে।

শিষ্য :—আপনার কৃপায় বেশ বুঝলাম। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, ঈশ্বর উপাসনায় সংলাবী জীবের ঐ যে বন্ধনবোধ, উহা কিভাবে তিরোহিত হয় ?

গুরু :—অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে সাধকের আপেক্ষিক বন্ধনগুলি তিরোহিত হতে থাকে অভ্যাসই মূল বস্তু। দুর্দান্ত মাতাল হতে হলে হঠাৎ একদিনে সম্ভব নহে, তেমনি জীবন্মুক্ত সাধক হতে হলেও তাহা একদিনে সম্ভব হয় না। জগদ্ব্যাপারে যেমন ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে পরিণতিক্রিয়া চলতে থাকে, সাধন-

পথেও ঠিক অনুরূপ তাই। প্রথমতঃ ছোট ছোট বাঁধনগুলি খুলে ফেলবার অভ্যাস করতে হয়। একটী বাঁধন খুলিয়া গেলে সাময়িক একটু মুক্তি অনুভব হয়। পরক্ষণেই পূর্ব্বে যাহাকে মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল, তাহাই বন্ধন বলেই আবার মনে হয়। মনে কর, সাধক গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে যখন প্রত্যাহার অভ্যাস করেন, তখন তিনি বহুবিষয়ের বাঁধন ছিন্ন করে, বহুধা ছড়ান মনটীকে কল্পিত ইষ্টদেবতার মূর্তিতে সংলগ্ন করিতে চেষ্টা করেন। সাধক জপে বসিয়া প্রথমতঃ মনে করেন—বিষয় চিন্তাই বন্ধন, ঐ বন্ধন টুটিলে মূর্ত্তি-চিন্তারূপ মুক্তি বা শান্তি পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে সাধকের মূর্ত্তি দর্শনে অভ্যাসপটুতা দেখা গেল।

শিষ্য :—সাধক ঐখানেই মুক্ত হলেন ত ?

গুরু :—না বৎস, তখন সাধকের ঐ বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু আয়াসসাধ্য সাধনার ধন মূর্ত্তি দর্শনেও আর তৃপ্তি হয় না। ঐটী তখন আবার তীব্র বন্ধন বলিয়াই মনে হয়, অসহনীয় জ্বালা অনুভূত হয়। তখন সাধকের মন সর্ব্বদা আরও কিছু দেখিবার জন্ত অস্থির হয় তীব্রব্যাকুলতারূপ-বন্ধন-পীড়নে সাধক তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। ক্রমে সাধক ধ্যানজগতে পৌছাইলেন, ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিলেন। আঃ, কি আনন্দ! এই বলিয়া সাধক তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

শিষ্য :—করুণাময়, এখানেও কি সাধকের মুক্তি হইল না ?

গুরু :—না, না, বৎস! মুক্তি এখনও বহু দূরে। স্থির হয়ে শোন—সাধক ধ্যান-জগতে উপনীত হয়ে বিবিধরাগরঞ্জিত নিত্য নূতন জ্যোতি দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে এখানেও অশান্তি এসে দেখা দিল। বহুজন্মের কঠোর সাধনায় সাধক আজ যে জ্যোতি দর্শন করিলেন, যাহা চির-আকাঙ্ক্ষিত কাম্য বলিয়া ধারণা ছিল,

যাহার প্রথম দর্শনে, আঃ কি আনন্দ! বলিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত-বিগলিত-অশ্রুধারায় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণযুগল প্রক্ষালিত করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। আজ সাধকের সেই জ্যোতি দর্শনেও আর তৃপ্তি হচ্ছে না, আরও আরও কিছু তৃপ্তিজনক দেখতে চান। ক্রমে অভ্যাসের ফলে তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধক একদিন জ্যোতিতে বিন্দু দর্শন করিলেন, কিন্তু তাতেও সাধকের বন্ধনবোধ গেল না, ঐ বিন্দুটীকে ধরে রাখতে হচ্ছে—উহাও সাধকের নিকট একটা জ্বালা বলে মনে হচ্ছে।

শিষ্য :- ইহার কি শেষ নাই, গুরুদেব?

গুরু :—এই অতৃপ্তির কারণ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ বন্ধন-বোধের শেষ হবে না। এই অতৃপ্তির কারণ কি জান,—উহার নাম অহঙ্কার। মন বুদ্ধি চিত্ত সবই ডুবে গেছে। এখন মাত্র অহঙ্কার জাগরিত আছেন। ঐ অহঙ্কারই ঐ বিন্দুকে ধরে রেখেছেন। সাধক এই সু-উচ্চস্থানে উঠিয়াও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস চালাতে লাগলেন। ক্রমে 'কার'ও ডুবে গেল, 'অহং' এখন নিষ্ক্রিয়, 'অহং'এর "কার" অর্থাৎ কার্য্য নাই। মাত্র অহং এই ভাবটুকু জেগে আছে। ইহাই বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ বা শূন্যবাদ কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এ অবস্থাকেও মুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—ঐ 'অহং' ভাবটুকুও অর্থাৎ 'অহং অস্মি' আমি আছি; এই ভাবটুকুও সাধকের নিকট বন্ধন। ঐ অস্মিতাটুকুও ডুবাইয়া দিয়া অব্যক্তব্রহ্মে সমাহিত হওয়াই মুক্তি বা নির্ব্বাণ। ইহাই শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতবাদ।

শিষ্য :—আপনার কৃপায় মুক্তি শব্দের ব্যাখ্যা বেশ বুঝলাম। এখন দয়া করিয়া বলুন, 'জীবন্মুক্তি' শব্দে কি বুঝিব?

গুরু :—জীবন্মুক্তি অর্থে এই বুঝিও, জীবিত অবস্থায়, অর্থাৎ কর্মজীবনে বন্ধনবোধ না থাকা। সাধকজীব সাধন সোপানে উঠতে

উঠ্তে নিষ্ক্রিয় অহংভাবে যখন পৌঁছে যান, তখনই তিনি বুঝতে পারেন, অব্যক্ত ব্রহ্ম 'আমি'-রূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত, সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণে গুণিত হয়ে কোথাও এই ভাব—আমি হাসছি, কোথাও কাঁদছি। সর্ব্বকর্তৃত্বগুলি ভিন্নমুখী হয়ে চালিত হলেও সেই একেরই প্রেরণায় বা ইচ্ছায় চালিত হচ্ছে, তখন জীবন্মুক্ত সাধক নিজ কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া ভিন্ন কর্তৃত্ব ভাবটুকু বিসর্জ্জন দিয়া এককর্তৃত্ব বোধটুকু লইয়া ধ্যানজগৎ হইতে সংসার ব্যাপারে নেমে এসে সাধারণ ব্যক্তির মতই বিচরণ করেন; কিন্তু তিনি আত্মসম্বেদনের দ্বারা মনটাকে স্থির করিয়া রাখেন—তিনি যা করেন, যা ভাবেন, যা বলেন, সব সেই অব্যক্ত ব্রহ্মের কর্তৃত্ব বা সেই 'আমি'র বিকাশ।

শিষ্য :—এরূপ মুক্ত ব্যক্তির পারিবারিক ব্যাপারে সুখ, দুঃখের অনুভব থাকে কি? আহার, নিদ্রায় ইচ্ছা থাকে কি?

গুরু :—থাকে। তবে সাধারণ জীবের মত কোন প্রবৃত্তিই তাঁর বা অদম্য থাকে না। [illegible] বুঝতে পারিক লোকাতুর [illegible], কিন্তু [illegible] হন নাই। তুমি নিজে কর্তা সেজেই পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয়ে সুখ দুঃখ অনুভব করছ, শোক-তাপে আত্মহারা হয়ে পড়ছ, অভাব দেখে অবসাদে পিষ্ট হচ্ছ, আকাঙ্ক্ষার আগুনে দগ্ধ হচ্ছ। আর মুক্ত জীব সাধনালব্ধ অনুভূতির দ্বারা একান্তরূপে জানেন, তিনি পাপ-পুণ্যের অধিকারী নন, ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা নন, সুখ দুঃখের ভোক্তা নন। তিনি প্রকৃতির ধর্ম্মে আহার নিদ্রা যান, সব কিছু করেন। তাঁর কল্পনা আছে, ব্যর্থতাও আছে। তিনি রাজ্যশাসন করতে পারেন, প্রজাপালন করতে পারেন, অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করতে পারেন, মতবাদের মীমাংসা করতে পারেন, ধর্ম্মযুদ্ধে নির্ভীক সেনাপতি হতে পারেন, আবার বশিষ্ঠদেবের মত শতপুত্রের পিতাও হতে পারেন। কিন্তু নাই তাঁর কর্ত্তৃত্বে

অভিমান, নাই তাঁর ব্যর্থতায় অবসন্নতা, নাই তাঁর শোকে মুহ্যমানতা। বিশাল মহীরুহের পত্র, পুষ্প, ফল বাতাসে পরিচালিত হয়ে যেমন দুলিতে থাকিলেও তার মূল গুঁড়ি কোনদিন দোলে না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত সাধকের মধ্যে পুণ্য কর্তৃত্বের স্পন্দন কোনদিনই উঠে না। অথবা সাধন পথে অগ্রসর হও বৎস, রসগোল্লা খাও, উহার আস্বাদ বুঝিতে পারিবে। উহা ভাষা দিয়া বোঝান যায় না।

শিষ্য:—জীবন্মুক্ত সকল সাধকই একভাবে চলাফেরা করেন?

গুরু:—না, বৎস। ঈশ্বর সম্বন্ধে কর্তৃত্ব ভিন্নই পরম আত্মার এই বোধ এক হলেও আধারানুযায়ী প্রকৃতিগতভেদে মুক্ত সাধকের মধ্যেও অগণিত ভেদ দেখা যায়। সকলেই সমান বিভূতিমান হন না, সকলের আচারব্যবহারও নির্দিষ্ট পথে একভাবে চলে না। মুক্ত সাধকের জাত নাই, নিয়মানুবর্তিতা নাই, এমনকি জাতিগত বৈশিষ্ট্যও নাই।

শিষ্য:—গুরুদেব, আপনি আনন্দময় হয়ে, বড় আনন্দ পেলাম। এখন কৃপা করে বলুন,—বর্তমানযুগে অধিকসংখ্যক হিন্দুসন্তানগণ পাশ্চাত্য আসুরিকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকূপে নেমে এসেছেন, ভোগসর্বস্ব শিশ্নোদরপরায়ণ হয়ে ধ্বংসের মুখে ছুটিছেন। সর্বহারা অসহায় দুর্বল জাতি ও হিন্দুসন্তানগণের রক্ষার উপায় কি গুরুদেব?

গুরু:—বৎস, তোমার এই প্রশ্নে বড় আনন্দ পেলাম। সাধনা-সংযমনিরুদ্ধ সত্যসেবী পবিত্র আর্য্যঋষির বীর্য্যে যে হিন্দুসন্তানগণের জন্ম, অমৃতের সন্তান বলিয়া যারা চিরপরিচিত, তাদের ধ্বংস নাই। "শতং জীবেম শরদো [illegible]" এই মন্ত্র পাঠ করে যাঁরা নিজেদের অভ্যুদয় কামনা করেন, তাঁদের ধ্বংস করবার শক্তি জগতে কাহারও নাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ে যখন একেবারে অব্যক্ত হবে, তখন আর্য্য-ঋষির বংশধরেরাও অব্যক্ত হবেন। তবে যাঁরা পরিচয়

হারিয়ে অহিন্দুত্ব-ভাবমদিরায় উন্মত্ত হয়ে নামেমাত্র হিন্দু অর্থাৎ আসুরিক হিন্দুত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁদের ধ্বংসের দিন অতি নিকটে। পুরা পূর্ব্ব যুগে সুর (দেব)-বিরোধী অসুরকুল যেমন মাত্র পুরুষাকারকে আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে পারে নাই, বর্ত্তমান যুগেও সেইরূপ আসুরিক হিন্দুগণ যতই মাত্র পুরুষাকারের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন, অমিততেজা দেবদ্রোহী বৃত্রাসুরের মত তাঁদেরও ধ্বংস হতে হবে। ফলে উপাসনাবিমুখ হিন্দুসন্তানগণ দিন দিন দুর্ব্বল সংখ্যাহীন সঙ্ঘহীন নগণ্যরূপে পরিগণিত হবেন।

শিষ্য :—আপনি আসুরিক হিন্দু এই যে সংজ্ঞা দিলেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন? আর আসুরিক হিন্দুত্বই বা লক্ষণ কি?

গুরু :—বৎস, কোন ব্যক্তিবিশেষকে আমি লক্ষ্য করি নাই। আমি একটা বিরাট অংশকেই লক্ষ্য করে কথা বলছি। বৎস, যাঁরা সুর নহেন, অর্থাৎ দেব-বিরোধী তাঁরাই অসুর। অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বরের উপাসনায়, এক কথায় সাধনায় বিমুখ বা বিরোধী তাঁরাই অসুর। পরদোষ অন্বেষণই অসুরের প্রধান লক্ষণ, আর নিজদোষ পরিমার্জ্জনই দেবতার লক্ষণ। নিজ দোষ পরিমার্জ্জন করতে হলেই পবিত্র সংসর্গের একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বর অপেক্ষা পবিত্রসংসর্গ আর্য্যঋষিগণ আর কল্পনা করতে পারেন নাই। তাই ঈশ্বর উপাসনায় পাপক্ষয় হয়, জ্ঞানাগ্নির উজ্জ্বলতায় মলিনতার ধ্বংস হয়। মলিনতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেই নিজ পরিচয় ফিরে পেয়ে হিন্দুসন্তান অমৃতের পুত্র হন। তুমি তাকিয়ে দেখ বৎস, লক্ষ লক্ষ উপবীতধারী হিন্দুসন্তানগণ যজ্ঞসূত্র গলে রেখেছেন, হয় সামাজিক একটু সুবিধার জন্য, নয়ত বা ম্রিয়মাণ সংস্কারের প্রভাবে এখনও ফেলে দেন নাই, কিন্তু বলতে পার, কোন যুক্তিতে তাঁরা গায়ত্রীবর্জ্জিত। যদি তাঁদের পুরুষানুক্রমে আচরিত গায়ত্রী পাঠ করা আসুরিক যুক্তিতে অনুচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়া

থাকে, উহা গ্রহণ করিবার বা পুত্রাদিগণকে উপবীত করিবার কি যুক্তি আছে। তিল, তুলসী, কুশ, গঙ্গাজল, অগ্নি, শালগ্রাম, ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রভৃতি হিন্দুর চিরাচরিত ঋষি-অনুমোদিত এই সব পবিত্র সত্ত্বার সম্মুখে নিত্য করণীয় বলিয়া গায়ত্রী-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁরা সেই প্রতিশ্রুত ব্রত ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁরা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে যত বড়ই শক্তিশালী হউন, হিন্দুধর্ম্মে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নাই, তামা-তুলসী শালগ্রাম শীলার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস নাই। তাঁরা অতি সামান্য সময়সাধ্য নিত্যকরণীয় ব্রতভঙ্গ করিয়া প্রত্যহই সত্যের নিকট অপরাধী হইতেছেন। প্রত্যহ এইরূপ নৈতিক দৌর্ব্বল্যে দুর্ব্বল হইয়া সত্যের প্রতি মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া সত্যভঙ্গে অভ্যস্ত হয়েই পড়ছেন। উচ্চশিক্ষিত মুসলমানগণ নামাজ পড়িতে, খৃষ্টানগণ গির্জ্জায় যাইতে নৈতিক দৌর্ব্বল্যে লজ্জা অনুভব করেন না; কিন্তু গায়ত্রী পাঠ করতে লজ্জানুভব করেন আমাদের সমাজের উপবীতধারী নেতৃস্থানীয় হিন্দু-সন্তানগণ। ভারতের লাটসাহেবকেও প্রতি রবিবারে নিয়মিত-ভাবে গির্জ্জায় যাইতে দেখিয়াছি, তাতে তাঁর স্বধর্ম্মের সম্ভ্রমবৃদ্ধিই হয়েছে, বহু নিম্নস্তরের খৃষ্টানগণ ঐ উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। খৃষ্টধর্ম্মের জাতিগত মর্য্যাদার পুষ্টিবর্দ্ধনই হচ্ছে, কিন্তু হায় বড়লাট-সাহেবের তুলনায় নগণ্য অনেক অধস্তন হিন্দু কর্ম্মচারী, কতকগুলি কু-তর্ক তুলিয়া অতি বিজ্ঞের ন্যায় স্বীয় ধর্ম্মানুশীলনকে কুসংস্কার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। কৃতবিদ্য হিন্দু নেতৃগণ অসাধ্য সাধন করতে পারেন, কেবল পারেন না ঈশ্বর উপাসনায় যোগদান করতে। অথবা তেমন আঘাত পান নাই বলেই এখনও দূরে আছেন।

শিষ্য :—এর প্রতিকার কি গুরুদেব ?

গুরু :—এর প্রতিকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাশ্চাত্য কায়দা ত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে আসা। প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক সংসারে,

প্রত্যেক পর্ণকুটীরে একটা করিয়া উপাসনা স্থান তৈরী করে নিতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যিনি যখন যেটুকু সময় পান, তাঁকে সেই উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করে গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে মনটাকে ক্ষণিক ঈশ্বরমুখী করে নিয়ে আসতে হবে। ছোট ছোট ক্রমবর্দ্ধমান ভবিষ্যৎ বংশধর শিশুগণ যাতে প্রত্যহ ঈশ্বরের স্তবস্তুতি সমবেতকণ্ঠে পাঠ করে, তদ্বিষয়ে পিতামাতা গুরুজন তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখ্‌বেন। নিজেরাও প্রথম প্রথম যোগদান করিয়া তাহাদের অভ্যাসী করিয়া তুলিবেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম, অপরে শিখাও"— মহাপুরুষের এই বাণী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখ্‌তে হবে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের ব্যক্তিগত সাধনা।

শিষ্য :—আপনি বল্‌ছেন, এইরূপ ব্যক্তিগত সাধনার অভ্যাসের ফলে অনেকের মধ্যে হিন্দুত্ব জেগে উঠ্‌বে। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ হিন্দু-সংস্কৃতির ভিতর দিয়া গঠিত হবে?

গুরু :—হাঁ বৎস, হিন্দুমতে অর্থাৎ পাশ্চাত্য কায়দায় নহে, যাকে বলে, হিন্দুর সংস্কৃতির ভিতর দিয়া যাঁরা সাধন-ভজন করেন না, অথবা নিত্যকরণীয় প্রত্যহ উপাসনায় যোগদান করেন না, অথবা পিতৃপুরুষকে সারা বৎসরেও একগণ্ডুষ জল দেন না, তিনি যে কোন বিদ্যায়ই কৃতবিদ্য হউন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের কি গৌরব বর্দ্ধন করবেন? অনেকে নিজে হিন্দুত্ব লাভ করেন নাই, অথচ হিন্দুর নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। এইরূপ নেতৃত্বে হিন্দুধর্ম্মের কি পুষ্টিসাধন হবে? যদি বল, তারা রাজনৈতিক হিন্দু, আমি বলি— তিনি যে নৈতিক হউন, প্রথমে অর্থাৎ মূলে তাঁকে সত্য সত্য হিন্দু হতে হবে। লবণ-বিহীন ব্যঞ্জনাদি, যতই উৎকৃষ্ট উপাদান-মিশ্রণে প্রস্তুত হউক, উহা অখাদ্য, পংক্তি ভোজনে অচল, তেমনি যতই শিক্ষিত পদস্থ তথাকথিত হিন্দু হউন, তিনি যদি উপাসনাবিহীন হন, উপবীতধারী হয়েও গায়ত্রী-বর্জ্জিত হন, আত্মপরিচয়

হায়া হন, কেবলমাত্র হিন্দুকুলে জন্মলাভ করেছেন বলেই পূর্ণ হিন্দুত্ব তিনি দাবী করতে পারেন না। হিন্দুর এই ব্যক্তিগত ঈশ্বর উপাসনাকে যেদিন হিন্দুরা জাতীয়-উপাসনা বলে দাবী ও অনুশীলন করতে পারবেন, সেইদিনই হিন্দুর জাতীয়তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, নতুবা দুরাশা। হও তুমি দুরাচারী, হও তুমি অখাদ্যভোজী, হও তুমি ঘৃণিত ব্যভিচারী, হও তুমি নীচ জাতি, তুমি উপাসনা লও, ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে অভ্যাসরূপ বন্ধুটীর হাত ধরে সাধন-পথে অগ্রসর হও, তোমার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হবে, তুমি হিন্দুত্বের সন্ধান পাবে, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হবে, অমর পিতার পরিচয়ে উল্লসিত হবে, তখনই তুমি দিগবিজয়ী হবে, জীবন্মুক্তির সন্ধান পাবে, প্রকৃত স্বাধীন হবে

শিষ্য :—গুরুদেব, বেশ বুঝলাম—ঈশ্বরের সঙ্গে এককর্তৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হলেই সাধক জীবিত অবস্থায়ও মুক্ত হতে পারেন। আর ঐ এককর্তৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছেন—জন্মজন্মান্তরব্যাপী প্রাত্যহিক ঈশ্বরমুখী বৈধ-অনুশীলন - উহারই নাম সাধনা বা উপাসনা।

গুরু :—হাঁ বৎস, অভ্যাসই মূল বস্তু। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার অভ্যাসে বিরাট মরুভূমি, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণার অভ্যস্ত সম্মিলনে সপ্তসমুদ্রের সৃষ্টি, অতিসূক্ষ্ম অণুগুলির স্বাভাবিক অভ্যাসে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তেমনি প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য ঈশ্বরোপাসনা বা সাধনার অভ্যাসই একজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও সাধকরূপে পরিণত করে, আবার ঐ অভ্যাসই সুদীর্ঘ স্থায়ী হলে একদিন এককর্তৃত্ববোধ জাগ্রত করে সত্য সত্যই সাধককে জীবন্মুক্তি দান করে থাকে। ঐ এককর্তৃত্ববোধই গার্হস্থ্য আশ্রমে সর্ব্বোত্তম যোগ। উহাই গীতার 'যোগস্থকুরুকর্ম্মাণি' অর্থাৎ কর্ম্মযোগ।

শিষ্য :—সন্ন্যাস আশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ কি, গুরুদেব ?

গুরু :—পূর্ব্বেই বহুবার বলেছি বৎস, মনকে বৃত্তিহীন করিয়া পরমাত্মার সঙ্গে একীকরণ, অর্থাৎ বোধাতীত হওয়া, ইহাই সন্ন্যাস আশ্রমের সর্ব্বোত্তম যোগ। উহাই গীতার জ্ঞানযোগ। বৎস, আশ্রমগত বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও। কতকটা গৃহস্থের ধর্ম্ম, কতকটা সন্ন্যাসীর আচরণ একসঙ্গে মিলাইয়া খিচুরী আশ্রমে পরিণত করিও না। আশ্রমগত আদর্শভ্রষ্ট হলে, কিবা সন্ন্যাসী কিবা গৃহী কেহ কোনদিন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমি পরে বিশ্লেষণ করিব।

শিষ্য :—গৃহস্থগণ কি সন্ন্যাসীগণের মত কেবল সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করিবেন না?

গুরু :—বৎস, কেবল-সাত্ত্বিকভাবের উদয় হলে যে আর সংসার থাকে না, দেহও থাকে না। যাক্ সে অনেক কথা। সত্ত্বমুখী রজোগুণই গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রাণশক্তি, জগৎকল্যাণকর কর্ম্মক্ষেত্রকে সত্ত্বমুখী রজোগুণ দিয়েই প্রস্তুত করতে হয়। বৎস, তমোমুখী নিম্নাভিগামী রজোগুণই গার্হস্থ্য আশ্রমে দুঃখ, দৈন্য, শোক, তাপ, বিফলতা, যত কিছু অনর্থ টেনে নিয়ে আসে, শেষে মানব-সমাজকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেয়; তুমি ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে উঠ, বিষয়-সম্পত্তি বিপুলভাবে অর্জ্জন কর, রাজ্য বিস্তার কর, অথবা জাতীয়তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর, বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোল, সভাসমিতি করে পৃথিবীর বুকে ধর্ম্ম প্রচার কর, বিশ্বের দরবারে হিন্দু আদর্শ মস্তক উঁচু করে দাঁড়াও, খুব আনন্দের কথা; আমিও তাই চাই বৎস, কিন্তু সাবধান, ঐ সকল কার্য্যের পিছনে রেখো—তোমার দৈনন্দিন ঈশ্বর উপাসনা, তোমার সত্যানুরাগ, তোমার ঐশী-ভক্তিশ্রদ্ধা, তোমার অভেদ্যবিশ্বাস, আর রেখো—তমোগুণাশ্রিতঅহঙ্কারধ্বংসকারী সেই অলঙ্ঘ্যবীর্য্য কর্ত্তার সঙ্গে এককর্তৃত্ববোধ। নতুবা "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম" সবই বিফল হবে।

তৎসৎ।

বিশ্ব-শান্তি-প্রার্থনা।

(শ্রীভূপতিচরণস্মৃতিতীর্থবিরচিতং)

(১)

সর্ব্বলোক-বন্দনীয়-সর্ব্বদেব-পূজিতাম্ ।
কোটি-সূর্য্য-রাজি-দিব্য-শান্তমূর্ত্তিধারিকাম।
বিশ্বভার-হার-পাল-সৃষ্টিখেল-কারিণীম্ ।
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম্ ॥

(২)

দেবদৈত্যযক্ষনাগসিদ্ধচারসেবিতাম্ ।
কামরোষলোভমোহমত্ততাদিনাশিকাম্ ॥
বিশ্বলোকপালিকাং হি বিশ্বরূপধারিণীম্ ।
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম ॥

(৩)

পাপলিপ্তভক্ত-দেহদৃষ্টিমাত্রপাবিকাম্ ।
দেবদেবচিত্তহারি-চারুরূপধারিকাম্ ॥
প্রেম-ভক্তি-দিব্যনীতি-ভুক্তি-মুক্তি-সাধিনীম্ ।
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম্ ॥

(৪)

ব্রহ্মরূপকল্পনীয়দেবদেহধারিকাম্ ।
শ্রেষ্ঠযোগিযোগিনীঞ্চ, যোগবিদ্যাদায়িকাম্ ॥
বিশ্বদর্পরূপিণীং হি বিশ্বদর্পনাশিনীম্ ।
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম্ ॥

(৫)

বেদবাদি-নাদবাদি-ভক্ত-সঙ্ঘ-বেষ্টিতাম্ ।
রক্ত-পঙ্কজাতিরক্ত-পাদযুগ্ম-শোভিতাম্ ॥
অদ্রি-লব্ধ-পারিজাতপুষ্পমালাধারিণীম্ ।
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম্ ॥

(৬)

রক্তরাগলেপনেনদিব্যদেহরঞ্জিতাম ।
চণ্ডমুণ্ড-রক্তবীজ-শুম্ভদৈত্যনাশিকাম ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-সর্ব্বলোক-দুঃখ-নাশকারিণীম্ ।
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম্ ॥

(৭)

পুত্রমিত্রবন্ধুবর্গমোহপাশছেদিকাম ।
রোগশোকতাপপাপভীতচিত্তরক্ষিকাম ॥
জীর্ণদীর্ণমর্ত্ত্যদেহসর্ব্বদোষহারিণীম্
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম ॥

(৮)

দাস-দাস-নিত্যদাসশুদ্ধবুদ্ধিদায়িকাম ।
ভক্তবর্গকুপ্রবৃত্তি শীঘ্রনাশ-কারিকাম্ ॥
দুষ্টচিত্তনাশিকাং হি শুদ্ধমার্গদর্শিনীম ।
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম ॥

(৯)

নির্ব্বিকারবিশ্বনাথপাদপদ্মশোভিতাম্ ।
সর্ব্বশক্তিদায়িকাং হি সর্ব্বভাবভাবিতাং ॥
বিশ্বভীতিকারিকাং হি, বিশ্বভীতিহারিণীম্ ।
ত্বাং নমামি বিশ্বদেবি, বিশ্বশান্তিদায়িনীম্ ॥

ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যম্ শক্তিপীঠে কৃতাঞ্জলিঃ ।
সবেদঃ সুধাকণ্ঠৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥